তত্ত্ব-বিজ্ঞান

শ্রীরমেশ চন্দ্র দেব।

প্রকাশক—

শ্রীরমেশ চন্দ্র দেব,

আসানসোল।

১৯৩৪

কলিকাতা, ১২, সিমলা ষ্ট্রীট্,

এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

যাহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, চরিত্রমাধুর্য্য ও লোকহিতৈষণার মধ্যে

কর্ম্মগত তত্ত্বজ্ঞান পরিদৃষ্ট হইত

আমার সেই

চিরারাধ্য ও চিরস্মরণীয়

স্বর্গগত

পিতৃদেবের চরণে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিরূপে

অর্পণ করিলাম।

———

লেখকের নিবেদন।

বহুদিন হইতে আমি কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছি। যখন প্রথমে লিখিতে আরম্ভ করি, এ সকল প্রবন্ধ যে কোনদিন পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব এরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল না। দর্শনশাস্ত্র অনুশীলনে নিজের ও কয়েকজন শিক্ষানুরাগী বন্ধুর সহায়তা করিবে, এই ভাবিয়াই প্রবন্ধগুলি প্রথমে লিখিতে আরম্ভ করি। এরূপে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখা হইল। এক্ষণে কয়েকজন কৃতবিদ্য বন্ধুর আগ্রহে ও সহায়তায় এ সকল প্রবন্ধ খণ্ড খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে চলিল। নানা অবস্থার মধ্যে থাকিয়া এ সকল প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে। কাজেই সবগুলি সমান সফলতা লাভ করিবে এরূপ আশা করা যায় না। যাঁহারা অগ্রিম গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, আমার সেই কৃতবিদ্য বন্ধুবর্গের নিকটে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রফেসার গ্রীণ, প্রফেসার কেয়ার্ড, ডাক্তার মার্টিনো প্রভৃতি আরও কয়েকজন খ্যাতনামা আধুনিক পণ্ডিতের গ্রন্থ হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন প্লেটো, সক্রেটিস্ ও এরিষ্টটল্ হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক ক্যাণ্ট, হিগেল, ফিক্টে প্রভৃতি দার্শনিকগণের মত ও বিশ্বাস আলোচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় প্রাচীন ঋষিগণের তত্ত্বজ্ঞানামৃত বেদ, বেদান্ত ও ষড়দর্শনের অক্ষয়-

ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছে। ভারতের ধর্ম্মারণ্যে তাঁহাদের যে পদরেণু পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা শ্রদ্ধার সহিত মস্তকে ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ দেশের আধুনিক কোন কোন গ্রন্থকারের সহায়তাও অনেক স্থলে লাভ করিয়াছি। তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকটেও বিশেষভাবে ঋণী। কিন্তু প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রধানতঃ যে সিদ্ধান্তটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি নিজেই সম্পূর্ণ দায়ী। কাহারও মত বিশ্বাস বা ব্যাখ্যা প্রণালী অন্ধভাবে অনুসরণ করি নাই। সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছি। বিবিধ সিদ্ধান্ত ও সমালোচনার মধ্য দিয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি তাহা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব, সুতরাং তজ্জন্য আমি নিজেই দায়ী।

শ্রীরমেশ চন্দ্র দেব।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববিজ্ঞান প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইল। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলিও খণ্ড খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। শিক্ষিত সমাজে যাহাতে সহজ ভাষায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের বিষয়সমূহ সম্যক্ আলোচিত হয়, ইহাই এই প্রচারের উদ্দেশ্য। আমার ক্ষুদ্রশক্তি কতটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা সহৃদয় ও সুশিক্ষিত পাঠকবর্গের বিচারেই স্থিরীকৃত হইবে।

প্রবন্ধাবলী।

২য় খণ্ড—(১) বেদের ধর্ম্ম, (২) বেদান্তের ধর্ম্ম, (৩) সাংখ্য দর্শন, (৪) পাতঞ্জল দর্শন, (৫) ন্যায় ও বৈশেষিক, (৬) পূর্ব্বমীমাংসা, (৭) উত্তর মীমাংসা (৮) বৌদ্ধদর্শন (৯) পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম, (১০) বৈষ্ণব ধর্ম্ম, (১১) ব্রাহ্মধর্ম্ম, (১২) উপসংহার। ৩য় খণ্ড—গীতার শিক্ষা। ভগবদ্গীতার সমালোচনা ও গবেষণাপূর্ণ বিস্তৃত ব্যাখ্যা। ৪র্থ খণ্ড—পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস। ইহাতে বঙ্গভাষায় Bacon, Descartes, Spinoza, Leibnitz, Locke, Berkeley, Hume, Kant, Hegel, Fichte, Caird, Green, Reid, Hamilton, Couzin, Martineau প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের দর্শনশাস্ত্রের ধারাবাহিক আলোচনা থাকিবে। ৫ম খণ্ড—সাংখ্যদর্শন। মহাত্মা ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা অবলম্বনে ব্যাখ্যাত সমগ্র সাংখ্যদর্শন। ৬ষ্ঠ খণ্ড—বেদান্তদর্শন। রামানুজের শ্রীভাষ্য ও শঙ্করের শারীরক ভাষ্য অবলম্বনে ব্যাখ্যাত ব্রহ্মসূত্র। **তিন মাস অন্তর এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে।** প্রতিখণ্ডের মূল্য ১৲ (কাপড়ের মলাট)। প্রতি খণ্ডে অন্যূন ১১০ পৃষ্ঠা থাকিবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩॥০ টাকা। যাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে এক খণ্ড অতিরিক্ত দেওয়া হইবে।

সূচী।

ধ্র
২৬
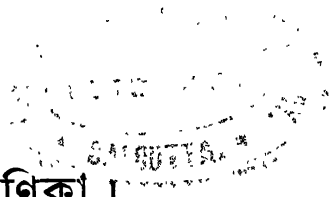
উপক্রমণিকা।

মানবজাতির ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তত্ত্বজ্ঞানের জন্ম। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা মানবপ্রকৃতির সহিত জড়িত। মানব শিশুর অর্দ্ধস্ফুট ভাষার মধ্যে ইহার আভাস পাওয়া যায়। শিশু যখন কথা বলিতে শেখে, নানা প্রকার প্রশ্নদ্বারা পিতামাতাকে অস্থির করিয়া তোলে, তখন হইতেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়। বৃক্ষ লতা ও পত্র পুষ্পাদি কে সৃষ্টি করিল, চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদি কোথা হইতে আসিল, বৃষ্টির জল, আকাশের বায়ু, কাননের ফুল কোথা হইতে আসে এ সকল প্রশ্ন শিশুর দীন ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসা প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখা দেয়। আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল পদার্থ রহিয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি মানুষের সৃষ্ট নহে। এ সকল পদার্থের কারণ খুঁজিতে গিয়া আমরা যে একজন স্রষ্টার অস্তিত্বে উপনীত হই, ইহাই ত আমাদের ধর্ম্মজ্ঞানের প্রথম সোপান। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় জাতীয় জীবনেও তত্ত্বজ্ঞান-বিকাশের শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য রহিয়াছে। অসভ্যজাতি সমূহ কোথাও একেবারে তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত নহে। তাহারাও বিশ্ব, মানব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা না একটা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। নানা তর্ক বিতর্কের মধ্যদিয়া তাহাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসাও ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এরূপভাবে তত্ত্বজ্ঞানের জন্ম ও বিকাশের রহস্য উদঘাটন করিতে হইলে সুদীর্ঘ প্রবন্ধের প্রয়োজন। ‘অন্তর্জ্জগতে বিবর্ত্তনবাদ’ নামক প্রবন্ধে আমি এ বিষয়টী বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

যখন ব্যক্তিগত ও জাতিগত ধর্ম্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে

একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, যখন ইহার মধ্যে একটা চিন্তা ও ভাষার জমাট বাঁধে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী গড়িয়া উঠে, তখনই প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের জন্ম। এই অর্থেই সর্ব্বত্র দর্শনশাস্ত্র শব্দটী গৃহীত হইয়াছে। এই অর্থেই দর্শন-শাস্ত্রের অপর নাম তত্ত্ববিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান, ন্যায়বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞান এই তত্ত্ববিজ্ঞানের অন্তর্গত। আমরাও এই অর্থেই তত্ত্ববিজ্ঞান শব্দটী গ্রহণ করিয়াছি। ক্রমে ক্রমে আমরা বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যে উক্ত বিষয় সমূহ বিবৃত করিব। তন্মধ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থে যে সকল বিষয় আলোচনা করা হইবে, সূচনায় অতি সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি।

সর্ব্বপ্রথমে আমরা জড়বাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। জড়বাদি-গণের মতে বিশ্বের যাবদীয় পদার্থ জড় পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন। এই পরমাণু সকল নিখিল বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। দুটী গুণের সমবায়ে ইহাদের প্রকৃতি গঠিত। এক বিস্তৃতি (extension) আর এক বাধকতা (resistability). এই দুই গুণের সমবায়ে গঠিত বলিয়া ইহারা পরস্পর হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, এবং পরস্পর সম্মিলিত হইয়া বিবিধ জড় বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছে। আধুনিক জড়বাদিগণের মতে জড় পরমাণুর পশ্চাতে এক অন্ধ জড়শক্তি রহিয়াছে। ইহাকেই তাঁহারা মৌলিক জড় পদার্থ বলেন। এই শক্তিই সমগ্র বিশ্বের আদি কারণ। আবার এই শক্তিই সর্ব্ব প্রথমে জড় পরমাণুরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিশ্বের যাবদীয় বস্তু এই পরমাণু সমূহের সংযোগে উৎপন্ন। শুধু জড় বস্তু নহে, উদ্ভিদ ও জড়দেহও ইহাদের সংযোগপ্রসূত। পরমাণুর প্রকৃতি-নিহিত অন্ধশক্তি ভিন্ন অন্য কোন প্রকার শক্তি হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই অন্ধশক্তির অসাধ্য

কিছুই নাই। মানুষের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, আত্মজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি যাহা কিছু দেখা যায়, তাহাও এই অন্ধশক্তি হইতেই সমুদ্ভূত। সুতরাং বিশ্বমূলে কোন সজ্ঞান শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই।

অন্য এক শ্রেণীর দার্শনিক বলেন, সমগ্র বহির্জ্জগৎ এক অফুরন্ত ঘটনা-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহাদের মতে আমরা জ্ঞানরাজ্যে যতদূর অগ্রসর হই না কেন এই ঘটনা রাশির বাহিরে এক পাও অগ্রসর হইতে পারি না। ইঁহারা ঘটনাবাদী নামে পরিচিত। বহির্জ্জগতে আমাদের চারিধারে যাহা কিছু ঘটে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে এক সীমাহীন ঘটনাপ্রবাহ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে; অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে শাখা প্রশাখার আবির্ভাব হয়। ইহা হইতে আবার ফুল ও ফলের উৎপত্তি হয়। সেই ফল হইতে আবার অঙ্কুর জন্মে। এরূপে সর্ব্বত্রই একটা পরস্পর সম্বদ্ধ ঘটনাবলীর অফুরন্ত প্রবাহ ভিন্ন বহির্জ্জগতে আর কিছুই নাই। জ্ঞান বল, আত্মা বল, মন বল, বুদ্ধি বল সকলই ভাবসমষ্টির নামান্তর মাত্র। ইহাও একটা পরি-বর্ত্তন স্রোত ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিত্য পদার্থ বলিয়া কিছুই নাই। আত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া যে নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা মানুষের কল্পনাপ্রসূত।

এক শ্রেণীর ঘটনাবাদী আছেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কতকটা উন্নততর। তাঁহাদের মতে পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলীর পশ্চাতে কোন নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর। কিন্তু এরূপ কোন বস্তু থাকিলেও তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। কারণ আমাদের মনোবৃত্তি ঘটনাবলীর সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ অজ্ঞেয়বাদী নামে পরিচিত। কারণ তাহারা এক নিত্যবস্তুর অস্তিত্ব

কতকটা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃতি নির্ণয় করা অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন।

সেশ্বরবাদী দার্শনিকগণ আত্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা এই সংশয়বাদের অসারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহারা জীবাত্মার প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছেন। জীবাত্মার সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ বিচার দ্বারা তাঁহারা বিশ্বাত্মা ও পরমাত্মার সত্তায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা জগতের কারণরূপী পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাঁহাদের মতে বিশ্বস্রষ্টা পরমপুরুষ জ্ঞানময়, প্রেমময় ও ইচ্ছাময়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ এই জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছারই অভিব্যক্তি। ব্রহ্মসত্তায় পঁহুছিবার জন্য তাঁহারা দুটি পন্থা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। প্রথম পন্থা আত্মতত্ত্ব হইতে ব্রহ্মসত্তায় উপনীত হওয়া। দ্বিতীয় পন্থা বিশ্বতত্ত্ব হইতে ব্রহ্ম-সত্তায় উপনীত হওয়া। মানবাত্মা পরমাত্মার অপূর্ণ প্রকাশ। তাই মানবাত্মার প্রকৃতি নির্ণীত হইলে ভগবৎ-প্রকৃতি নির্ণয় সম্ভবপর হয়। আবার বিশ্বের মধ্যে যে উদ্দেশ্য ও উপায় নির্ব্বাচনের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা দ্বারা স্রষ্টার বুদ্ধিমত্তা ও অপার কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সেশ্বরবাদী দার্শনিকগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানতঃ, তাঁহারা তিনটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। প্রথম সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী দ্বিতীয় সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদী, এবং তৃতীয় সম্প্রদায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।

দ্বৈতবাদী দার্শনিকদিগের মতে স্রষ্টা সৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া কতগুলি প্রাকৃতিক ও নৈতিক নিয়মের অনুবলে জগৎ শাসন করিতেছেন। তাঁহা-দের মতে ঈশ্বর জগদ্ব্যাপারে অন্তর্নিবিষ্ট নিত্যক্রিয়াশীল শক্তি নহেন। মানবজীবন যদিও তাঁহার আদর্শেই গঠিত, ইহা ব্রহ্মসত্তার সহিত একী-ভূত নহে। ঈশ্বর মানুষকে আত্মোন্নতি-সাধনের শক্তি প্রদান করিয়াই

সৃষ্টি করিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনের ক্ষমতা রহিয়াছে। কোন কোন দ্বৈতবাদীর মতে মানুষ ভবিষ্যতে যাহা করিবে তাহা ভগবানের অজ্ঞাত। যদি মানুষের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানই থাকিল তাহা হইলে মানুষের আর স্বাধীনতা রহিল কোথায় ?

দ্বিতীয় এক শ্রেণীর সেশ্বরবাদী আছেন, তাঁহারা এই দ্বৈতবাদের বিরোধী। কিন্তু দ্বৈতবাদের দোষত্রুটি প্রদর্শন করিতে গিয়া তাঁহারা অন্ধভাবে ইহার ঠিক বিপরীত দিকে ছুটিয়াছেন। তাঁহারা অদ্বৈতবাদী নামে বিদিত। এই অদ্বৈতবাদ আবার দেশভেদে দুই বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রতীচ্য অদ্বৈতবাদিগণ বিশ্ব ও স্রষ্টার মধ্যে কোন পার্থক্যই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আমরা যাহাকে বিশ্ব বলি, তাহাই ঈশ্বর। আবার ঈশ্বরও বিশ্ব-ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে।

ভারতীয় অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ মায়াবাদী নামে পরিচিত। কারণ তাঁহাদের মতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়া-প্রসূত। ইহার বাস্তবিক কোন অস্তিত্বই নাই। ইহা মানুষের অজ্ঞানতা হইতে সঞ্জাত। তাঁহাদের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বিশ্ব, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে একমাত্র নামেরই প্রভেদ। ব্রহ্ম ভিন্ন আর যাহা কিছুর অস্তিত্ব অনুভূত হয়, তাহা ভ্রান্তি-সম্ভূত। জীবাত্মা যখন আপনাকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করে তখনই তাহার ভ্রান্তিজাল ছিন্ন হইয়া যায়। জীব ও বিশ্বরূপে ব্রহ্মবস্তুর যে অনুভূতি হইয়া থাকে, তাহা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় অলীক। আমরা যখন জ্ঞানোদয়ে মায়া বা অবিদ্যার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিব, তখন একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করিব না। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরবয়ব। আমরা যে তাঁহাতে গুণ ধর্ম্মের আরোপ করি তাহাও আমাদের অজ্ঞানতার পরিচায়ক। জ্ঞানোদয়ে যখন এই ভ্রান্তিও দূরীভূত হইবে, তখন

একমাত্র নির্গুণ, নিরুপাধি, তুরীয়-স্বরূপ পরব্রহ্মের অস্তিত্বই অনুভূত হইবে।

অপর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহারা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। বিশ্ব, জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত ও দোষবর্জ্জিত। একমাত্র তাঁহারাই সবদিকে দৃষ্টি রাখিয়া এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিমূলে এক জ্ঞানময়ী মহাশক্তি বিরাজ করিতেছে। ইহাতে একাধারে জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির সমন্বয় রহিয়াছে। জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির সমন্বয়ে ইঁহার প্রকৃতি গঠিত বলিয়া, ইঁহাকে পরম-পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছার বাহিরে একটা পরমাণুও থাকিতে পারে না।

দেশভেদে এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদও দুই পৃথক্ আকার ধারণ করিয়াছে। তবে এই পার্থক্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদের উৎপত্তি ও প্রণালীর বিশেষত্ব লইয়া। প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না।

শ্রীসম্প্রদায় নামধেয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্য এদেশে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত। কিন্তু ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিলে জানা যায় যে, রামানুজ স্বামী আবির্ভূত হওয়ার বহুপূর্ব্বে এদেশে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কারণ, অতি প্রাচীন উপনিষদ্‌সমূহেও ইহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। মহর্ষি বাদরায়ণের বেদান্তদর্শনেও এই মতই বিবৃত হইয়াছে। ঋষি সম্প্রদায় নামধেয় বৈষ্ণব সমাজের প্রবর্ত্তক মহর্ষি নিম্বাদিত্য উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতঃ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ, অর্থাৎ উভয়রূপী। তিনি একদিকে পূর্ণস্বভাব বলিয়া

তাঁহাতে গুণ ও গুণী বলিয়া কোন পার্থক্য সম্ভব নহে। তাঁহার গুণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকাতে তিনি নির্গুণ। আবার নির্গুণ বা গুণাতীত হইয়াও আপনাকে বিশ্বরূপে প্রকটিত করতঃ সগুণ-সত্তা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। নির্গুণ বলিলেই যে অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুর সবটা বলা হইল তাহা নহে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞস্বভাব। সৃষ্টিকার্য্য যখন তাঁহার প্রকৃতির সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত, তিনি যে কখনও কর্ম্মহীন হইয়া অবস্থান করেন এরূপ সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক। স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণের বিকারভূত। ব্রহ্ম ইহার সহিত নিত্য বিজড়িত থাকিয়াও আপন সত্তায় ত্রিগুণাতীত। কারণ, ত্রিগুণ তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। জীব ব্রহ্মের অংশীভূত, সুতরাং তাঁহা হইতে অভিন্ন, কিন্তু তাঁহার সহিত একীভূত নহে। ব্রহ্ম জীবকৃত দুষ্কৃতির ভোক্তা নহেন। কারণ, জীব ব্রহ্মস্বভাব বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বিভু নহে। তাহাতে সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা নাই। ফলতঃ, সূর্য্য যেমন এক হইয়াও বিভিন্ন পাত্রস্থিত জলে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পান, তদ্রূপ ব্রহ্মও এক অদ্বিতীয় থাকিয়া বিভিন্ন জীবদেহের মধ্যদিয়া আপনাকে বিভিন্ন জীবরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানুজস্বামী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলিয়া পরিচিত। তাঁহার সিদ্ধান্ত সমূহ অনেকাংশে নিম্বাদিত্যের অনুরূপ। কিন্তু নিম্বাদিত্যের বিচার সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম। রামানুজের সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত স্থূল। তাঁহার মতে বিশ্ব ও জীবের স্বতন্ত্র সত্তা রহিয়াছে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের সীমা কোথায়, তিনি তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি ভক্ত দার্শনিক বলিয়া অনেকটা দ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর। জীবাত্মার

স্বাধীনতা ও ভগবানের বিধান লইয়া যে দার্শনিক জটিল সমস্যা রহিয়াছে, তিনি তাহারও সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন নাই।

পাশ্চাত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিজ্ঞানবাদ (Idealism) নামে পরিচিত। ইহার মূলভিত্তি আত্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী আত্মবিশ্লেষণ করতঃ, তাহা হইতে বিজ্ঞানবাদিগণ (Idealists) যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাদ্বারা, তাহা আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। তবে তাঁহাদের সিদ্ধান্তসমূহ ভারতীয় ব্রহ্মবাদের ন্যায় এতটা গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করে না।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদিগণের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিমূলে যে মহাশক্তি বিরাজ করিতেছে, তাহা অন্ধ শক্তি নহে। এই শক্তি আত্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন। ইহাতে জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় রহিয়াছে। তিনি পূর্ণজ্ঞান; সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। আমাদের জ্ঞানসাপেক্ষ ক্ষুদ্র জগৎটী যেরূপ আমার বিজ্ঞান সমষ্টিমাত্র, এই সীমাহীন অখণ্ড বিশ্বও তেমনই সেই পূর্ণজ্ঞানে এক বিরাট্ বিজ্ঞানসমষ্টিরূপে (aggregate of ideas) বিরাজ করিতেছে। বিশ্ব প্রতি মুহূর্ত্তে এই জ্ঞানেই বিরাজ করিতেছে। তিনি আবার প্রেম স্বরূপ। অনাদি কাল হইতে লীলাময় পুরুষ এই বিশ্ব রঙ্গালয়ে প্রেমের লীলা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এই প্রেম কর্ম্মশক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। জীবাত্মা পরমাত্মসাগরে জলবিম্বরূপে অবস্থান করিতেছে। পরমাত্মা চির মঙ্গল ও চির পবিত্র। তিনি নিশিদিন আমাদিগকে সেই চিরশুভ্র মূর্ত্তি দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতেছেন। অনন্ত জীবন-পথে তাঁহার দয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল। তিনি আমাদের সমগ্র জীবনের চরম পরিণতি।

জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদ।

জড়বাদিগণের মতে বিশ্বের যাবদীয় পদার্থ একপ্রকার মৌলিক জড়-পরমাণুর সংঘটনে উৎপন্ন। এই পরমাণু সকল নিখিল বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। একটা জড় বস্তুকে অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু সর্ব্বশেষে ইহা যখন পরমাণুতে পরিণত হয় আর বিভক্ত করা সম্ভব হয় না। জগতের প্রত্যেক বস্তুই স্থানাবরোধক বা বিস্তৃতিধর্ম্মবিশিষ্ট। অর্থাৎ ইহা একটা না একটা স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেই এবং অন্য বস্তু সে স্থান অধিকার করিতে আসিলে তাহাতে বাধা প্রদান করিবে। জড়-পরমাণু যখন এই জড়-বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র, ইহাও extension ও resistence এই দুই গুণ-বিশিষ্ট। কোন কোন জড়বাদী একটি মাত্র গুণ স্বীকার করেন। কারণ extension কে resistence হইতে পৃথক ধর্ম্ম না বলিয়া ইহার একটা রূপান্তর বলা যায়। অন্য পরমাণুকে বাধা দিবার শক্তি আছে বলিয়াই প্রত্যেক পরমাণু একটা স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে সক্ষম। যাহা হউক আধুনিক জড়বাদিগণ এই জড়-পরমাণুগুলিকে স্বাধীন বা স্বয়ম্ভূত (self-existent or self-originated) বলিতে রাজী নহেন। তাঁহাদের মতে জগতের যাবদীয় বস্তুর পশ্চাতে এক অন্ধ জড়শক্তি রহিয়াছে। ইহাকেই তাঁহারা মৌলিক জড়-পদার্থ (matter) বলিতে চাহেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন—'আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা এইটুকু বলিতে পারিয়াছি যে এই বিশ্ব প্রপঞ্চের আদি কারণরূপে এক মহাশক্তি রহিয়াছে।' এই

২

শক্তি নিখিল জগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। তিনি এই মহাশক্তিকে জড় শক্তি নামেই অভিহিত করিয়াছেন। এই জড়শক্তিই অবস্থাভেদে বিভিন্ন স্থানাবরোধক (extended) বস্তুরূপে প্রকাশ পায়। ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহত্তম বস্তু পর্য্যন্ত সমস্তই এই মহাশক্তির প্রকাশ। এই শক্তিই সমগ্র বিশ্বের আদি কারণ। সুতরাং ইহা স্বাধীন (self-existent). এই শক্তি হইতে অসংখ্য জড়-পরমাণুর সৃষ্টি হইয়াছে। অথবা এই শক্তিই জড়াণুসমষ্টি রূপে পরিণত হইয়াছে। শক্তি হইতে উৎপন্ন বা শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই জড় পরমাণুগুলিও শক্তিসম্পন্ন; সুতরাং গতিশীল ও ক্রিয়াশীল। কেহ কেহ বলেন এই জড় পরমাণুগুলি বিভিন্ন গুণধর্ম্মাক্রান্ত। ইহাতেই বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন আদিম পরমাণুতে কোন প্রকার গুণগত পার্থক্য নাই। বিভিন্ন শ্রেণীর জড় বস্তুর উৎপত্তি ইহাদের সংযোগের প্রকারভেদ হইতেই সম্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই জড়-পরমাণুগুলি ক্রিয়াশীল ও গতিশীল। গতি বা কম্পন (motion) ইহাদের প্রকৃতিনিহিত। এই কম্পন হইতেই-ইহাদের পক্ষে বিভিন্ন ভাবে সংযোগ সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে যে শুধু বিভিন্ন প্রকার জড় বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে তাহা নহে। উদ্ভিদ ও জীবদেহের সুশৃঙ্খল গঠনও ইহাদের সম্মিলনেই সম্ভব হইয়াছে। উদ্ভিদ ও জীবদেহকে এই অন্ধ জড় পরমাণুর এক সুশৃঙ্খল বিন্যাস বা সংযোগ ভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। মনুষ্যদেহও এই সংযোগের উৎকৃষ্টতম ফল। পরমাণুর প্রকৃতিনিহিত কম্পন বা ঘূর্ণন ভিন্ন অন্য কোন কৌশলময়ী শক্তির সাহায্যে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ

নাই। এই অন্ধ শক্তির বলে না হইতে পারে এমন কিছুই নাই। মানুষের মধ্যে যে অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও এই সুন্দর দেহগঠনের ফল মাত্র। আত্মজ্ঞান (self-consciousness), নীতিজ্ঞান (conscience) ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি নানা আকারে মানব-বুদ্ধির পরিণতি ঘটিয়াছে। এই সমস্তই সেই আদিকারণরূপী অন্ধশক্তি হইতে সমুদ্ভূত। কারণ মনই বল আর আত্মাই বল যাহা হইতে এ সব সম্ভব হইয়াছে, তাহা কতকগুলি ভাবসমষ্টি (aggregate of ideas) ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ভাবসমষ্টি আবার আমাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে সঞ্জাত। সুতরাং কি ভাবে আমাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলিতে থাকে তাহা বুঝিতে পারিলেই এই ভাবগুলি সম্বন্ধে সমুদয় সংশয় দূর হইয়া যায়। কীটের ডিম্বের ন্যায় গোলাকার একপ্রকার পদার্থের (globular cells) সমবায়ে আমাদের মস্তিষ্ক গঠিত। এই cells গুলি আবার অতি সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় এক প্রকার শিরাদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। এই শিরাগুলি মেরুদণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী আর কতগুলি সূক্ষ্মশিরার সহিত সংযুক্ত। এই শেষোক্ত শিরাগুলি আবার চক্ষু-কর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয়স্থিত অপর কতকগুলি cells এর সহিত সম্বদ্ধ। যখন বাহিরের কোন বস্তু আসিয়া এই বহিরিন্দ্রিয়স্থ cells গুলির মধ্যে কোন প্রকার ক্রিয়া উৎপাদন করে, তাহাতে উক্ত শিরাগুলির সাহায্যে মস্তিষ্কে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। মানবমনের ভাবসমষ্টি এই রাসায়নিক ক্রিয়ারই ফলস্বরূপ। এমন কোন ভাব বা idea থাকিতে পারে না, যাহা মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং মানুষের সমস্ত চিন্তা বা ভাবসমষ্টি জড় শক্তি বা matter এর পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রাচীন জড়বাদিগণ

বলেন আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে আর এক প্রকার সূক্ষ্ম অণুসমষ্টি আছে; বাহ্যবস্তুর শক্তিতে তাহাতে যখন কম্পন উপস্থিত হয়, তখন আমাদের তদনুযায়ী ধারণা জন্মে।

আধুনিক জড়বাদিগণের মতে আমাদের ধারণা মস্তিষ্কের কোন প্রকার অঙ্গ বিশেষ হইতে লব্ধ নহে। ইহা সমগ্র মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়-গুলির সম্মিলিত ক্রিয়ার ফল। দুই প্রকার কঠিন পদার্থের সংঘর্ষণে যেরূপ অগ্নি ও বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, মস্তিষ্কের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তদ্রূপ ভাবসমষ্টির সৃষ্টি হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক্ জড়বাদিগণের মত কতদূর সমীচীন। তাঁহারা বলিবেন আমরা যে সকল অচেতন বস্তু দেখিতে পাই তাহা জড় পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। কিন্তু কিরূপে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জড় পরমাণুগুলি পরস্পর সম্মিলিত হইয়া প্রস্তর মৃত্তিকা প্রভৃতির সৃষ্টি করিল,—তাহা একবার অনুধাবন করিয়া দেখা প্রয়োজন। অবশ্য জড়বাদিগণ বলিবেন ইহা জড় পরমাণুর প্রকৃতিনিহিত অন্ধ শক্তির কার্য্য। কিন্তু এই যে শক্তি জড় পরমাণুর কারণ বা ইহাদের সম্মিলনের কারণ রূপে থাকিয়া জগতের যাবদীয় বস্তু ও ঘটনা উৎপাদন করিতেছে সর্ব্বাগ্রে ইহার প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। যদি ইহাতে কম্পন বা ঘূর্ণন ক্রিয়াটীর নামান্তর মাত্র বুঝায় তবে ইহাকে শক্তি বলাই অসঙ্গত। কারণ ইহা একটা ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন মাত্র। এই পরিবর্ত্তনের মূলে যাহা কার্য্য করিতেছে তাহারই প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। আর যদি ইহাকে এই পরিবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ রূপে 'একটা কোন প্রকার শক্তি' বলিয়া ধরা যায় তবে এই 'একটা কোন প্রকার শক্তি'র স্বরূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। যদি বলা যায় যে ইহার প্রকৃতি

আমাদের জ্ঞানের অগম্য। ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার মত আমাদের এমন কোন মানসিক বৃত্তি নাই। তাহা হইলে ত অজ্ঞেয়বাদ আসিয়া দাঁড়াইল। এই অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। আর যদি ইহাকে জ্ঞেয় বলা হয় তবে ইহা একটী substance বা মৌলিক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই মৌলিক পদার্থ বা শক্তি সজ্ঞান কি অজ্ঞান তাহাই নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। আমরা ত অজ্ঞান শক্তি বলিয়া একটা বস্তুর অস্তিত্বই কল্পনা করিতে পারি না। আমাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম সমূহের অন্তরালে আমাদের দেহ সাপেক্ষ একটা জ্ঞানময়ী শক্তির সহিত আমরা পরিচিত। এই শক্তি আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত মনোবৃত্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যাহা হউক এই সজ্ঞান বা অজ্ঞান শক্তির প্রকৃতি নির্ণয় ব্যাপার লইয়া আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা উপস্থিত করিব। আর একটী কথা এই যে matter বা জড়ত্ব বলিলে extension বা বিস্তৃতি এবং resistence বা ঘর্ষণ ভিন্ন আমরা আর কিছুই বুঝি না। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, কাঠিন্য, শব্দ, বর্ণ প্রভৃতি জড় পদার্থের আর যাহা কিছু গুণ ধর্ম্ম আছে, তাহা সমস্তই এই গুণদ্বয়ের বহির্ব্বিকাশ মাত্র। কিন্তু বিস্তৃতি ও ঘর্ষণ (resistence) আমাদের মনের দুইটী ভাবের (ideas) নাম মাত্র। বিস্তৃতি ও বাধা প্রদান সম্বন্ধে ধারণা জন্মে আমাদের মনের মধ্যে। আমাদের মানসিক শক্তির অস্তিত্ব ভিন্ন এই বিস্তৃতি ও ঘর্ষণ (resis- tence) এই দুটী জড় ক্রিয়ার কোন অস্তিত্বই অসম্ভব। যখন বিস্তৃতি ও ঘর্ষণ মনের দুটী ভাবের নাম মাত্র তখন আমাদের মনেই ইহাদের স্থিতি। মানব মন এই দুটী ভাবের মধ্য দিয়াই দেশকালনিবদ্ধ জড় বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। আবার জড় শক্তি হইতেই আত্মজ্ঞান,

বাহ্যজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে জড়-বাদিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু জড় শক্তি যদি মানসিক শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ই হইবে তাহা হইলে ইহা হইতে এ সকল মানসিক বৃত্তির উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইল? একজাতীয় বস্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না।

আমাদের মানসিক শক্তিকে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করাও সম্পূর্ণ অসঙ্গত। আমরা ত প্রাকৃতিক জগতে (physical world) এক প্রকার কম্পন বা ঘূর্ণনকে অন্য প্রকার কম্পন বা ঘূর্ণনে পরিণত হইতে দেখি। Heat বা উত্তাপ তাড়িতের আকার ধারণ করে। ইহাদের উভয়ই আণবিক কম্পনের (molecular vibration) প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু উত্তাপের মাত্রা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তাহা তাড়িৎ আকারেই পরিণত হয়। এরূপে মস্তিষ্কের রাসায়নিক ক্রিয়া চিন্তা-শক্তির আকার ধারণ করিলে উৎকট চিন্তার সময় মস্তিষ্কের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া মন্দীভূত হইয়া যাইত। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে চিন্তা যত উৎকট হইবে মস্তিষ্কে রাসায়নিক ক্রিয়া ততই বৃদ্ধি পাইবে। আবার মানব মন যদি কতকগুলি ভাব-সমষ্টি মাত্রই হইবে তবে অসংখ্য পরিবর্ত্তনশীল ভাবের (ideas) মধ্যে প্রকাশশীল জ্ঞানবস্তু যে একভাবেই অবস্থান করিতেছে এরূপ ধারণা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। দেহাত্মবুদ্ধি হইতে আত্মার একত্বের অনুভূতি সম্পূর্ণ অসম্ভব; কারণ দেহবৃত্তি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। দেহের বিভিন্ন অংশে নিয়ত পরিবর্ত্তন ক্রিয়া চলিতেছে। আর একটী অসঙ্গতি এই যে জড়বাদিগণ জড়পদার্থকে বিস্তৃতি, বিভাজ্যতা, স্থানাবরোধকতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ ধর্ম্মে পরিণত করিয়া ফেলেন। ইহাদের প্রত্যেকটী

আমাদের মনের এক একটী ভাবের নাম। আবার তাঁহারা মনকে জড়-পদার্থ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পান। ইহাকে পাশ্চাত্য ন্যায় শাস্ত্রে বিচারবৃত্ত (circle in reasoning) বলে। ন্যায় শাস্ত্রমতে ইহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ (a logical fallacy). শুধু ন্যায় শাস্ত্রে কেন এই যুক্তির অসারতা সাধারণ জ্ঞানেও অনুভূত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে জড় শক্তির অস্তিত্ব বা অনুভূতি মাত্রই এক সজ্ঞান শক্তি বা বুদ্ধির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। শুধু তাহা নহে, ইহাই জড়পদার্থের অস্তিত্বের মূলে। কিন্তু আমাদের দেহ সাপেক্ষ বুদ্ধিবৃত্তি বা সজ্ঞান শক্তি বিশ্বের মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ। যে সজ্ঞানশক্তি বিশ্বের যাবদীয় পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর পশ্চাতে থাকিয়া এই বিশাল জগৎ প্রকাশ করিতেছে তাহাই ব্রহ্মশক্তি।

যাহা হউক আমরা অতি সংক্ষেপে জড়বাদের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলির উল্লেখ করিলাম মাত্র। যে উত্তরগুলি দেওয়া হইল তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইতেছে না। এই সংক্ষিপ্ত যুক্তিগুলির অনুবলে জড়বাদ খণ্ডন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা উপস্থিত করিব। তবে এই উত্তরগুলি বিশদরূপে ব্যক্ত করার পূর্ব্বে আমরা একবার অজ্ঞেয় বাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কারণ জড়বাদের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করা হইবে তাহার অনেকগুলি অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধেও তুল্যরূপে প্রযোজ্য। অজ্ঞেয়বাদ খণ্ডনের সময় আমাদিগকে সে সকল যুক্তির পুনরায় অবতারণা করিতে হইলে পুনরুক্তি দোষ ঘটিবে এবং তাহা অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হইবে।

এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত আছেন তাঁহারা ঘটনাবাদী; অর্থাৎ তাঁহাদের মতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ এক অফুরন্ত ঘটনা প্রবাহ

(succession of events) ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহারা বলেন আমরা জ্ঞান রাজ্যে যতদূর অগ্রসর হই না কেন এই ঘটনারাশির বাহিরে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিব না। সমগ্র বহির্জ্জগৎ একটা ঘটনা-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাগর হইতে বাষ্পের উৎপত্তি হইতেছে, সেই বাষ্প ঊর্দ্ধে নীত হইয়া মেঘের আকার ধারণ করিতেছে। সেই মেঘ আবার সুশীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া জলবিন্দুরূপে পরিণত হইতেছে। এই জলবিন্দু সমূহ বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিতেছে। ইহাতে সাগরে জল বৃদ্ধি হইতেছে। সেই জল আবার বাষ্পে পরিণত হইতেছে, আবার মেঘ ও বৃষ্টি, আবার সেই জল। এরূপে পরস্পর সম্বন্ধ ঘটনাবলীর একটা প্রবাহ ভিন্ন বহির্জ্জগতে আর কিছুই পাওয়া যায় না। মৃত্তিকার রসের অনুবলে তন্নিহিত একটা বীজ হইতে বৃক্ষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইল। অঙ্কুর মৃত্তিকার রস-সংযোগে বৃক্ষে পরিণত হইল, বৃক্ষটী আবার মৃত্তিকার রস আকর্ষণ করিয়া শাখা প্রশাখায় ভূষিত হইল। এই শাখা প্রশাখায় কালক্রমে ফুল ও ফল দেখা দিল। সেই ফুল ও ফল আবার কীট পতঙ্গ ও অন্যান্য জীবজন্তুর দেহাংশরূপে পরিণত হইল। সেই জীবদেহ আবার পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল। ইহার কতকাংশ আবার মৃত্তিকা ও জলে পরিণত হইয়া অন্য এক বিকাশোন্মুখ বীজ বা অঙ্কুরের জীবিকা হইয়া দাঁড়াইল। এ সমস্তই একটা পরিবর্ত্তন-স্রোত ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকেই এরূপ একটা পরিবর্ত্তন স্রোত, একটা অফুরন্ত ঘটনা প্রবাহ। আমাদের জ্ঞান এই পরিবর্ত্তন স্রোতেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ইহার বাহিরে যাওয়ার আর স্থান নাই, উপায় নাই। কাজেই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাসমষ্টির বাহিরে আমরা আর কিছুরই অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে পারি না। চারিদিকে কেবল পরিবর্ত্তন ! আমরা

এই অপার ঘটনা সাগরে আজীবন ভাসিতেছি। এই স্রোতে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নিত্য নূতন হইয়া যাইতেছি। কোথাও বিরাম নাই, কোথাও স্থিরতা নাই, কোথাও বিশ্রাম নাই!

এই ঘটনাবলীর সম্পর্কে আসিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের অনুরূপ ভাবসমূহ লাভ করিতেছে। এই বিরাট ঘটনাসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আমরা শুধু ইহার ঊর্ম্মিগুলি গণিতেছি। আর তাহার অনুরূপ এক একটী ভাবের (idea) সৃজন করিতেছি। আত্মা বল, জ্ঞান বল, মন বল এ শুধু সেই ভাবসমষ্টির নামান্তর মাত্র। বহির্জ্জগতে ঘটনাবলীর পশ্চাতে যেমন কোন নিত্য বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, আমাদের ইন্দ্রিয়-লব্ধ এই ভাবপ্রবাহের (aggregate of ideas) পশ্চাতেও নিত্য বস্তু বলিয়া কিছু দেখা যায় না। জন্ম ও মৃত্যু নামধেয় দুটী ঘটনার অন্তর্ব্বর্ত্তী এক একটী মানব জীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে মানব জীবন কতকগুলি ঘটনাসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর মানুষের মনও একটা ভাব সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিত্য ও অবিনশ্বর বলিয়া মানুষ যে এক আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে সে শুধু তাহার কল্পনাপ্রসূত। বাস্তবিক এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই স্থায়ী নহে। মানুষের মন বল, বুদ্ধি বল সবই পরিবর্ত্তনশীল। নিত্য ও পূর্ণ বলিয়া যে দুটী শব্দ আছে তাহা শূন্যগর্ভ; অর্থাৎ ইহার অনুরূপ কোন বস্তুই জগতে দেখা যায় না। সুতরাং ইহা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক জিনিস। ঘটনাগুলি স্বভাবতঃ পরস্পর দেশকালে সম্বদ্ধ হইয়াই ঘটিয়া থাকে। এক একটী ঘটনাসমষ্টিকে আমরা এক একটী বস্তু বা জীব বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। এরূপ এক একটী জীব বা বস্তু অপর জীব বা বস্তু হইতে কতকটা পৃথক্। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্যও

রহিয়াছে। মৃত্তিকার সঙ্গে বৃক্ষের, বৃক্ষের সঙ্গে জন্তুর, জন্তুর সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে। একটী অপরের জীবনের মূলে; একটী অপরটী ছাড়া থাকিতে পারে না। এরূপ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ঘটনা সমূহ অখণ্ড বিশ্বাকারে প্রকাশ পাইতেছে। কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্রিয়া গুলিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহার মধ্যে কতকগুলি ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সমষ্টি (aggregate of sensations), আর তদনুযায়ী কতকগুলি ভাব সমষ্টি (aggregate of ideas) ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না। মনে করুন বাগানে একটী গোলাপ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; চক্ষু যেন তাড়িতের শক্তিতে মস্তিষ্কের নিকট সেই খবরটা জ্ঞাপন করিল। অমনি মস্তিষ্কে ফুলটীর একটী ছবি অঙ্কিত হইয়া গেল। এই ছবিটীতেই আমাদের গোলাপ ফুলের উপলব্ধি। তারপর গোলাপের বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বিষয় লইয়া মস্তিষ্কে কতকগুলি চিন্তার উদয় হইল। কই ইহার মধ্যে ত আত্মা বলিয়া একটা জিনিস দেখিতে পাইলাম না। পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনই ত চলিতে লাগিল। মোটামুটি এই হইল ঘটনাবাদ। এই ঘটনাবাদ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ;— এক শ্রেণীর দার্শনিকগণ ঘটনা পরম্পরার অতিরিক্ত কিছু আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর দার্শনিকগণ ঘটনাবলীর পশ্চাতে কোন নিত্য বস্তু থাকা সম্ভব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ আমাদের মনোবৃত্তি ঘটনাবলীর সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকগণ দ্বিধারহিত ঘটনাবাদী (Pan-phenomenalists). দ্বিতীয় শ্রেণীর দার্শনিকগণ অজ্ঞেয়বাদী (agnostics). প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মতে একমাত্র ঘটনা সমষ্টিই সমগ্র

বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। অজ্ঞেয়বাদিগণ বলেন এক নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব ভিন্ন অনিত্য বস্তু সমূহের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। অনিত্য পদার্থের পশ্চাতে তাহার কারণ রূপে কোন না কোন নিত্য বস্তু রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত যে নিত্য বস্তুর ধারণা ব্যতীত অনিত্য বস্তুর কল্পনাও অসম্ভব। কিন্তু এই নিত্য বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান থাকাই সম্ভব নহে। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন উপস্থিত করিবার অধিকারও আমাদের নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়গণই আমাদের জ্ঞানের দ্বার। অন্য কোন রাস্তা নাই যাহার মধ্য দিয়া জ্ঞান যাতায়াত করিতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ যখন নিত্য বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই প্রদান করে না তখন সে সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

ইংলণ্ডের দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে হিউম, মিল ও স্পেন্সার অজ্ঞেয়বাদী। হিউম ও মিলকে অজ্ঞেয়বাদী না বলিয়া অনেক সময় সংশয়বাদী (sceptics) বলা হয়। কারণ তাঁহারা নিত্যবস্তুর অস্তিত্বেই সন্দিহান। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার কিন্তু সেশ্বরবাদের দিকে কতকটা অগ্রসর। কারণ তিনি নিত্য বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তবে অস্তিত্বমাত্রই (bare existence) স্বীকার করেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছু বলিতে প্রস্তুত নহেন। অর্থাৎ এই নিত্যবস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ সম্ভব বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। ইংরেজ দার্শনিক হেমিল্টন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন বটে; সে কিন্তু গায়ের জোরে। কারণ, তাঁহার মতে জ্ঞানবৃত্তির সাহায্যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের অস্তিত্বে উপনীত হইতে হইলে সরল বিশ্বাসের (common sense) উপর নির্ভর করিতে হয়। ঈশ্বর সত্তায় প্রবেশ করিবার আর

দ্বিতীয় পন্থা নাই। কিন্তু জ্ঞানে যাহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইল, সরল বিশ্বাসের দোহাই দিয়া তাহাকে মানিয়া লইলে চলিবে কেন? অমন ভিত্তিহীন সরল বিশ্বাসে কিছুতেই নির্ভর করা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক ইমেনুয়েল ক্যাণ্টও হিউমের দর্শনের সমালোচনা করিতে গিয়া নিজে অজ্ঞেয়বাদী হইয়া দাঁড়াইলেন। আত্মবস্তু ও ব্রহ্মবস্তুকে জ্ঞানরাজ্য হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদী হইয়াও মিল, স্পেন্সার ও ক্যাণ্ট নৈতিক জীবনের যে উচ্চ আদর্শ নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন অতি অল্পসংখ্যক বিশ্বাসীর পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছে। নৈতিক চরিত্রের বিশুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-মানবের হিতসাধনরূপ মহাব্রত তাঁহারা আজীবন উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। সুখ, সমৃদ্ধি ও যশঃস্পৃহার প্রলোভনে কখনও এই বিশ্বমানবের সেবাব্রত পরিত্যাগ করেন নাই। ন্যায়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও সত্যানুসন্ধিৎসা তাঁহাদের জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। তজ্জন্য আজও তাঁহারা মানবমণ্ডলীর ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি লাভ করিতেছেন। সুদৃঢ় ন্যায়পরতা চিরজীবন তাঁহাদিগকে সত্যানুসন্ধানে ও নরসেবায় ব্রতী করিয়াছিল। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কবির ভাষায় বলিতে হয়,—

'লও পূজা হে নাস্তিক, আস্তিকের গুরু।'

ইঁহারা নাস্তিক হইলেও আস্তিক নামে পরিচিত অসংখ্য ব্যক্তি ইঁহাদের পদপ্রান্তে বসিবারও যোগ্য নহেন। পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, বিশ্বাসের নামে কত নরহত্যা, কত অত্যাচার, কত অবিচার, কত নৃশংসতা, কত পাপের বিভীষিকা দেখা গিয়াছে। কাজেই এ প্রকার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কোন মূল্যই নাই।

সে যাহা হউক নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদ যে একান্তই ভিত্তিহীন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত জীবনের গৌরবময় ভিত্তিতে অজ্ঞেয়বাদ প্রতিষ্ঠা করা চলিবে না। কারণ অজ্ঞেয়বাদ যুক্তিবিরুদ্ধ, বিচারবিরুদ্ধ এবং মানবজাতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অনেক লোক দেখা যায় তাঁহারা আপনাদিগকে অজ্ঞেয়বাদী বলিয়া পরিচয় দিতে খুবই আগ্রহান্বিত। কিন্তু বিচার শক্তির অনুবলে এই অজ্ঞেয়বাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহারা সক্ষম নহেন। তাঁগারা শুধু মিল, স্পেন্সার ও ক্যাণ্ট প্রভৃতি মহাপ্রাণ অজ্ঞেয়বাদিগণের নামোল্লেখ করিয়াই আপনাদের অভিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এরূপ প্রকৃতির লোকগুলির জীবনের বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই। জ্ঞানে বা সত্যে তাঁহাদের অনুরাগ নাই। বিশ্বহিতৈষণার সহিত তাঁহারা কোন সম্পর্কই রাখেন না। শুধু সম্ভোগ তৃষ্ণা ও স্বার্থ-পরতা লইয়াই তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করেন। সত্য হইতে, ধর্ম্ম হইতে দূরে থাকিয়া তাঁহারা অজ্ঞানতার নিবিড় অন্ধকারেই আজীবন নিমগ্ন। তবে তর্কচ্ছলে তাঁহারা অজ্ঞেয়বাদের সমর্থনের নিমিত্ত যে সকল কথার অবতারণা করেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি অজ্ঞেয়বাদিগণ ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর কুসংস্কার ও বিবিধ কল্পনা জল্পনা লইয়া কালক্ষয় করেন নাই; তাঁহারা সত্যানুরাগ ও সত্যানুসন্ধানকেই জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের জীবন এত উন্নত। তাঁহাদের উত্তরে ইহা বলা যায় যে, মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি মনস্বী অজ্ঞেয়-বাদিগণের অজ্ঞেয়বাদটা গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের ন্যায় উন্নত জীবন লাভ করা সম্ভব হইবে না। সেরূপ সত্যানুরাগ, সত্যানুসন্ধান ও সর্ব্বোপরি বিশ্ব মানবের হিতাকাঙ্ক্ষা কয়জনের জীবনে দেখা যায়? জীবনের পবিত্রতারক্ষার জন্য তেমন জীবনব্যাপী সাধনার শক্তি কোথায় মিলিবে?

এরূপ উন্নত জীবনের দৃষ্টান্ত এদেশেও বিরল নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার দিনে বহু অজ্ঞেয়বাদী বৌদ্ধ সাধক সাম্য, মৈত্রী ও বৈরাগ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই সাধুতা, সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সেই বিশ্বহিতৈষণা জগতে অতীব বিরল।

যাহা হউক এ সকল অবান্তর বিষয়ের অবতারণার স্থান এই প্রবন্ধে হইবে না। আমরা এ স্থলে কয়েকজন ভারতীয় অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিকের মত উদ্ধৃত করিয়া আমাদের আলোচনা শেষ করিব। পরিশেষে অজ্ঞেয়-বাদ কিরূপ ভিত্তিহীন তাহা প্রদর্শন করিয়াই বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিব।

ভারতীয় অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিকগণ সংস্কৃত শাস্ত্রে চার্ব্বাক্ নামে পরিচিত। তাঁহাদের আপাত-মধুর বাক্যলহরীর জন্যই তাঁহারা এই আখ্যা লাভ কবিয়াছেন। একশ্রেণীর চার্ব্বাক্ আছেন তাঁহারা পঞ্চভূত-বিকার এই স্থূল দেহকে আত্মা নামে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে শরীর যখন পুত্র, কলত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্ত হইতেই প্রিয়তর, ইহাপেক্ষা প্রিয়তর আর যখন কিছুই নাই তখন শরীরই আত্মা। সুতরাং মৃত্যুকালে যখন দেহের বিনাশসাধন হইবে আর কিছুই থাকিবে না। অতএব,—

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য
পুনরাগমনং কুতঃ॥

ইঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আর এক শ্রেণীর চার্ব্বাক্ বলেন—স্থূল শরীরকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা স্থূলবুদ্ধিরই পরিচায়ক। তাঁহাদের মতে যে ইন্দ্রিয়গণ দেহের পরিচালক সেই ইন্দ্রিয়গণের সমষ্টিই

আত্মা। আর একশ্রেণীর উন্নততর চার্ব্বাক্ বলেন ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা বলা চলে না ; প্রাণই আত্মা ; কারণ প্রাণ না থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। প্রাণ থাকাতেই আবার আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমি তৃষ্ণার্ত্ত—এইরূপ প্রাণক্রিয়া সমূহ ব্যক্ত হইয়া থাকে। আর শ্রেণীর চার্ব্বাক্ প্রাণকেও আত্মা বলিতে রাজী নহেন। কারণ মনই সমস্ত প্রাণক্রিয়ার মূল। মন না থাকিলে ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভূতিরূপ প্রাণক্রিয়া অসম্ভব হইত। অন্তঃকরণ বৃত্তি যখন সুপ্তাবস্থায় বিলয়প্রাপ্ত হয় তখন কোন প্রকার প্রাণ ক্রিয়াই বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং, 'অন্তরাত্মা মনোময়ঃ'। ইঁহাদের অপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি একশ্রেণীর বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদির কোনটাই আত্মা নহে। বিজ্ঞানই আত্মা। তাঁহাদের মতে, 'আত্মা বিজ্ঞানময় ইত্যাদি শ্রুতেঃ কর্ত্তৃত্বভাবে করণস্য শক্ত্যভাবাৎ অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ বুদ্ধিরাত্মেতি।' অর্থাৎ তাঁহাদের মতে দেহ প্রাণ মন ইত্যাদি সমস্তই বুদ্ধিবৃত্তির যন্ত্রমাত্র। ইহারা জ্ঞানক্রিয়ার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া কর্ম্মসম্পাদনে সহায়তা করে এইমাত্র। বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিই এই জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা। এই বুদ্ধিই আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি সুন্দর ইত্যাদি অনুভূতির মূল। সুতরাং এই বিজ্ঞান বা বুদ্ধিই আত্মা!

ভট্ট নামক একজন মীমাংসক চৈতন্য ও অজ্ঞানের একীভূত অবস্থা বা আনন্দময় সত্তাকেই আত্মা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ সুষুপ্তির সময় বুদ্ধিবৃত্তি আনন্দময় অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়। একমাত্র আনন্দানুভূতিতেই সমগ্র বিজ্ঞান প্রলীন হইয়া যায়। কিন্তু অজ্ঞানাবস্থা জড়তার নামান্তর মাত্র। জড়তা হইতে কখনও আনন্দানুভূতি সম্ভব হয় না। একমাত্র জড় অজ্ঞানেই যদি বুদ্ধিবৃত্তি বিলীন হইয়া যাইবে সুষুপ্তির সময়

আনন্দানুভূতি কোথা হইতে আসে ? সুতরাং চিৎ ও অচিৎ, জড় ও চৈতন্য, অথবা অজ্ঞান ও পুরুষ এই উভয়ের একীভূত অবস্থাই আত্মা। "প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময় আত্মেতি।" বৈদান্তিকগণ ইহাপেক্ষা উন্নততর সোপানে আরূঢ় হইয়া বলিতেছেন,—

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবং
প্রত্যক্ চৈতন্যমেবাত্মতত্ত্বমিতি
বেদান্তবিদনুভবঃ।

বৈদান্তিক ঋষিগণের মতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং আনন্দময়মদ্বয়ং ব্রহ্ম।"

যাহা হউক এক্ষণে আমরা ভারতীয় অজ্ঞেয়বাদিদিগের সহিত পরিচয় লাভ করিলাম। তাঁহাদের মতসমূহ যুক্তিপরম্পরায় বেদান্তবাদে পরিণত হইয়া গেল। বেদান্তের এই মতসমূহ 'শঙ্করাচার্য্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদ' নামক প্রবন্ধে বিশদভাবে বিবৃত হইবে। 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামক প্রবন্ধেও ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। সুতরাং এ স্থলে তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে আমরা একবার পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদের অসারতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। ঘটনাবাদী, সংশয়বাদী ও অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিকগণ এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে যে এক জ্ঞানময়, চৈতন্য-স্বরূপ দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা রহিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু একজন দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা ভিন্ন কিরূপে যে ঘটনা সম্ভব হয়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইহার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। যাহা কালে সংঘটিত হয় তাহারই নাম ঘটনা। জ্ঞাতা না থাকিলে এই ঘটনার সাক্ষ্য দিবে কে ? কিসের উপর এই ঘটনা নির্ভর করিবে ? বাতাসে একটী বৃক্ষপত্র নড়িতেছে ;

আমি জ্ঞাতারূপে ইহার নিকটে উপস্থিত রহিয়াছি বলিয়াই ত আমার জ্ঞানে এই ঘটনাটী ঘটিল। আমি যদি দ্রষ্টা হইয়া উপস্থিত না থাকিতাম তবে ঘটনাটী আমার সম্বন্ধে ঘটিত না। অর্থাৎ এই ঘটনাটী সংঘটিত হওয়া না হওয়া আমার পক্ষে দুই সমান হইয়া যাইত। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলিতেছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে এখানে উপস্থিত না থাকিলেও এই গাছের পাতাটী নড়িতে পারে। অপর একব্যক্তি এখানে উপস্থিত থাকিলে ইহার সাক্ষ্যদান করিত। কিন্তু আমার ন্যায় দেহধারী ব্যক্তি মাত্রেরই অস্তিত্ব দেশকালে সীমাবদ্ধ। তোমার আমার সব সময় সবস্থানে যুগপৎ উপস্থিত থাকা সম্ভব নহে। এই অন্তহীন বিশ্বে অসংখ্য ঘটনা ঘটিতেছে যাহার সাক্ষীরূপে কোন দেহধারী মনুষ্য বিদ্যমান নাই। সুতরাং এ সকল ঘটনার জ্ঞাতারূপে এক দেশকালাতীত জ্ঞানময় পুরুষ থাকিবেনই।

দ্বিতীয়তঃ, একটী ঘটনা নিজে জ্ঞানবিশিষ্ট হইতে পারে না। সজ্ঞান ঘটনা একটী হাস্যকর কথা। এরূপে একটী ঘটনাসমষ্টিকেও জ্ঞানবিশিষ্ট বলা চলে না। যে জ্ঞান ব্যষ্টিতে নাই তাহা সমষ্টিতে থাকিতে পারে না। কারণ সমষ্টি ব্যষ্টির সমবায়ে গঠিত। মানবাত্মা যদি শুধু একটা পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাসমষ্টি বা ভাবসমষ্টিই হইবে, তাহা হইলে পরিবর্ত্তনশীল বস্তুকে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া জ্ঞাত হওয়া ইহার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইল ?

তৃতীয়তঃ, আত্মা বলিলে যদি শুধু একটা অনুভূতির সমষ্টি (aggregate of ideas) বুঝাইত, তাহা হইলে কোন অতীত ঘটনার স্মৃতিও সম্ভব হইত না। আমার জীবনে একটী ঘটনা হয়ত বহুকাল পূর্ব্বে ঘটিয়াছে আমার জ্ঞান বা আত্মা যদি সময়ের সহিত পরিবর্ত্তনশীল বস্তু মাত্র হইত তবে এতদিন পরে সেই ঘটনাটী পুনরায় স্মরণ করিতে পারিতাম

না। কারণ আমার তখনকার মন আর এখন থাকিত না। তখনকার 'আমি' ও এখনকার 'আমি' দুই পৃথক্ ব্যক্তি হইয়া যাইত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটী ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞানের অবসান হইত। অতএব আমাদের স্মৃতিশক্তি এক নিত্য জ্ঞান বস্তুর পরিচয় দিতেছে।

চতুর্থতঃ, আমার সমস্ত অস্তিত্বই যদি পরিবর্ত্তনশীল হইবে, তবে চিরদিন এক হইয়া আছি বলিয়া যে ধারণা আমার প্রাণে প্রাণে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। অনেক সময় বলিয়া থাকি ১০ বৎসর বয়সে আমি এই কাজটা করিয়াছিলাম। ১৫ বৎসর বয়সে আমার এই অভ্যাসটা ছিল। এক্ষণে বলুন দেখি, যদি আমার দেহ, মন, ও বুদ্ধির সব পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও নিত্য জিনিস বলিয়া কিছু না থাকিত তবে এই যে অপরিবর্ত্তনীয় চির আমিত্বের সংস্কার ইহা আমার পক্ষে সম্ভব হইত কি না? ভাব, মত, রুচি, বিশ্বাস, শারীরিক গঠন ইত্যাদির কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, অথচ আমার সেই আমিত্বের বিশ্বাস ত তিরোহিত হইল না। আমি ত সেই চির পুরাতন আমিই রহিলাম।

পঞ্চমতঃ, যদি সকলই পরির্ত্তনশীল হইবে, তাহা হইলে পূর্ণ ও নিত্য বলিয়া দুটী শব্দই থাকিত না। এক একটী শব্দ এক একটী মনের ভাব (idea) ব্যক্ত করে। নিত্য ও পরিপূর্ণ বলিয়া যদি আমাদের মন কোন বস্তুর সন্ধান লাভ না করিত এরূপ নিত্যতাও পরিপূর্ণতার ধারণাই অসম্ভব হইত। এখানেই জীবাত্মার অন্তরালবর্ত্তী পরমাত্মার প্রকাশ। এখানেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার যুগল মিলন। এই পূর্ণাপূর্ণবিবেকরূপ জ্ঞান মন্দিরেই পূর্ণদেবের অধিষ্ঠান।

ষষ্ঠতঃ, নিত্য ও অনিত্য দুটী শব্দ পরস্পর তুলনাসাপেক্ষ। নিত্য বস্তুর ধারণা ব্যতীত অনিত্যবস্তুর ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি বল

অনিত্যকে চিনি, নিত্যকে চিনি না, আমি বলিব নিত্যকে নিশ্চয় চিন নতুবা অনিত্যকে মোটেই চিনিতে পারিতে না। তবে আত্মরূপী সেই নিত্য পদার্থকে চিনিতে হইলে একবার জ্ঞানের অঞ্জন চোখে লাগাইতে হইবে। একটীবার ভাবসাগরে ডুব দিয়া এই অরূপরত্নের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে।

সপ্তমতঃ, আমরা যখন বহির্জ্জগতে কোন পরিবর্ত্তন আনয়ন করি, তাহার পূর্ব্বে আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ পায়। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করে। যাহা আমাদের ইচ্ছা-প্রসূত নহে, তাহা আমাদের নিজের কার্য্য নহে। এই অনন্ত বিশ্ব পূর্ণ করিয়া এক অফুরন্ত ক্রিয়া চলিতেছে। এই কর্ম্ম-সাগরেরর কূল কিনারা নাই। আমরা ইহার তীরে দাঁড়াইয়া দু একটী ঊর্ম্মি লক্ষ্য করিতেছি মাত্র। এই তরঙ্গতুফানময় বিশ্বপারাবারে তীরে দাঁড়াইয়া আমরা শুধু স্তম্ভিত ভাবে এই অপার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এ রহস্যের পার নাই, সীমা নাই। তাই মানব প্রাণ ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে,

"অপার রহস্যমাঝে কে তুমি মহিমাময় !"

এই রহস্যময় অনন্ত বিশ্ব পূর্ণ করিয়া যে সকল ক্রিয়া চলিতেছে ইহাদের উৎপত্তির কারণরূপে এক পূর্ণ ও সর্ব্বজ্ঞ ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই শক্তি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়াই বিশ্বের উৎপত্তি ও স্থিতির মূলে এত কৌশলের পরিচয় রহিয়াছে। সেই আদ্যাশক্তি বা পরম পুরুষের বুদ্ধি বা জ্ঞান হইতে এই উদ্দেশ্য ও উপায় রূপে সম্বদ্ধ ঘটনাবলীর উৎপত্তি হইয়াছে।

যাহা হউক এতক্ষণে আমরা বিভিন্ন প্রকার অজ্ঞেয়বাদের

সমালোচনা সমাপ্ত করিলাম। এই অজ্ঞেয়বাদের সমালোচনায় প্রমাণিত হইল যে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে এক জ্ঞানময় পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনিই বেদান্তের সেই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্ম।

আমরা জড়বাদের সমালোচনা অর্দ্ধসম্পন্ন রাখিয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। আবার জড়বাদিগণের সেই পুরাতন কথা আরম্ভ করিতে হইল। আমরা এক্ষণে জড়বাদের সমালোচনা বিশদরূপে উত্থাপিত করিব। এই সমালোচনা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইব তাহা অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধেও তুল্যরূপে প্রয়োজ্য। জড়বাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কতকগুলি আপত্তি ও অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা যায়। তজ্জন্য আমাদিগকে মাঝখানে অজ্ঞেয়বাদের অবতারণা করিতে হইয়াছিল। অজ্ঞেয়বাদের প্রারম্ভ কালেই সে কথা প্রকাশ করিয়াছি। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা দরকার যে আমাদিগকে কতকগুলি কথার পুনরুক্তি করিতে হইবে। বিষয়ের গুরুত্ববোধে এরূপ পুনরুক্তি না করিয়া উপায় নাই। অজ্ঞেয়বাদের সমালোচনাকালে এমন কতকগুলি উচ্চতত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে যে তাহা পুনরায় জড়বাদের সমালোচনাকালে ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। জড়বাদের সমালোচনাপ্রসঙ্গে আমরা কিছুদূর অগ্রসর হইলেই এ সকল পুনরুক্তির পরিচয় পাইব। পাঠকবর্গের যাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে তজ্জন্য অগ্রেই কথাটী বলিয়া রাখিলাম। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় এরূপ পুনরুক্তি অপরিহার্য্য।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে জড়বাদিগণের মতে আমরা যে সকল অচেতন বস্তু দেখিতে পাই, তাহা জড় পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। কিন্তু কোন্ শক্তিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অচেতন জড়পরমাণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত

হইয়া প্রস্তর মৃত্তিকা প্রভৃতির সৃষ্টি করিল, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। জড়বাদিগণ বলিবেন ইহা সেই অন্ধশক্তির কার্য্য, যাহা প্রতি জড়পরমাণুর অস্তিত্বের মূলে রহিয়াছে। জড়শক্তি বলিয়া একটা জিনিষ যে আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি, এখানেই আমাদের কাঁধে ভূত চাপিয়া বসিয়া আছে। এ ভূত যেন আমাদের কাঁধ হইতে কিছুতেই নামিতে চায় না। কিন্তু বাস্তবিক জড়শক্তি বলিয়া কিছুই নাই। এ যেন আলেয়ার আলো, মরুভূমির মরীচিকা। যে শক্তির কার্য্য আমরা বহির্জ্জগতে দেখিতে পাই তাহা যে জড়শক্তি ইহা আমাদের ধরিয়া নেওয়াই ভুল। সাধারণ কথায় বলে 'কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন'; এ যেন ঠিক তাই। জড় পদার্থ আবার শক্তি পাইল কোথা হইতে? শক্তি থাকিলে ত আর জড়ত্ব থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে হয়ত জড়বাদিগণ সক্রোধে বলিয়া উঠিবেন, "বল কি? জড়শক্তি কি দেখ নাই? তবে কোন্ শক্তিতে অমন সাগড়জোড়া জাহাজখানি দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া যায়? কোন্ শক্তির বলে ক্ষুদ্র একখানি Engine অমন দেশজোড়া রেল গাড়ীখানিকে এত দ্রুতবেগে টানিয়া লইয়া যায়? কে না জানে বিদ্যুতের শক্তির কথা? আচ্ছা, ক্রমে ক্রমে একবার এই বিষয়গুলি শান্তভাবে চিন্তা করিয়া দেখা যাক্। এই যে Engineখানির একটা শক্তি দেখা যায় ইহা কি বাস্তবিক জড়শক্তি? ধরিয়া নিলাম বাষ্পের একটা শক্তি আছে। এ শক্তি অন্ধশক্তি না হইলেও না হয় ধরিয়া নিলাম ইহা অন্ধশক্তি। কিন্তু একি শুধু বাষ্পের শক্তি যাহা এত বড় একটা কাণ্ড করিয়া তোলে? Engineএর এতগুলি কলকৌশল কোথা হইতে আসিল? এত প্রকার কলকব্জার যোগ্য সন্নিবেশ কোথা হইতে আসিল? ইহা কি মানব চিন্তা হইতে উদ্ভূত নহে? ইহা কি একটা সজ্ঞান কৌশলময়ী শক্তির প্রকাশ নহে?

আর অই যে Driverটী এই কলকারখানাগুলির সঙ্কেতটী জানিয়া ক্ষণে ক্ষণে আপনার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিতেছে, তাহা কি আমাদের প্রণিধানযোগ্য নহে? সে আপনার ক্ষুদ্রদেহের শক্তি প্রয়োগ করিয়া অমন Engineখানা একবার চালাইতেছে আবার থামাইতেছে। সত্য বটে কল কব্জাগুলির অনুবলে সে এতটা বিরাট্‌ কাণ্ড করিয়া তুলিতেছে। অর্থাৎ রেলগাড়ী যে চলে তাহা Engineer এবং Driver উভয়ের সম্মিলিত বুদ্ধিশক্তির ফলে। ষ্টিমার সম্বন্ধেও ঠিক তাই। এই যে ঘড়িটী আমার টেবিলের উপর টিক্‌ টিক্‌ করিয়া সারাদিন চলিতেছে, আপাততঃ দেখিলে মনে হয় ইহা অন্ধশক্তির ক্রিয়া। কিন্তু ইহার ভিতরের যন্ত্রগুলির দিকে দৃষ্টি করিলে সে বিশ্বাস চলিয়া যায়। ইহা মানব বুদ্ধির কি অপূর্ব্ব প্রকাশ! তারপর মাঝে মাঝে ঘড়িতে যে দম দেওয়া হয় ইহা ত ইচ্ছাশক্তির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ। যাহা হউক ধরিয়া নিলাম, জগতে অন্ধশক্তি বলিয়া একটা জিনিষ আছে যেমন Electricity, Magnetism, Gravitation ইত্যাদি। এইগুলি কোন মানববুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া আমাদের কাছে জড়শক্তিরূপেই পরিচিত। প্রাণিজগৎ কি অদ্ভুত রহস্যে পরিপূর্ণ! সর্ব্বোপরি মানবজীবন কি মহা রহস্য! মানবের কার্য্য, ও আচার ব্যবহারের কথা চিন্তা করিলে কি মহাবিস্ময়সাগরে মগ্ন হইতে হয়! মানবহৃদয়ে কত প্রেম! মানব-প্রাণে কত বল! মানবমনে কত চিন্তা, কত ভাব, কি বুদ্ধি, কি কৌশল! মানবের অন্তর্জ্জগৎ বহির্জ্জগতের ন্যায় কত বিশাল! যুগ যুগান্তর ধরিয়া কত কাব্য, কত পুরাণ, কত বেদ, কত বেদান্ত, কত ইতিহাস, কত বিজ্ঞান এই বিশালত্বের সাক্ষ্য দিতেছে! সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি কত রহিয়াছে! এখন একবার ভাবুন দেখি

মানবজীবনে এত জ্ঞান গরিমা কোথা হইতে আসিল? মানুষ প্রেমের জন্য কি না করিতে পারে? সর্ব্বোপরি আত্মজ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞান মানুষ কোথা হইতে পাইল? আপনারা কি এখনও চোককাণ বুজিয়া বলিবেন যে এসব কতকগুলি জড়পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন? এখনও কি বলিতে চাহেন যে এসব এক অন্ধ জড়শক্তির রূপান্তর মাত্র? কি করিয়া বলিবেন যে অন্ধশক্তি হইতে, অস্থি পঞ্জর ও রক্তমাংসের দেহ হইতে, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির আবির্ভাব হইল? কারণে যাহা নাই কার্য্যে তাহা কোথা হইতে আসিল? জলে যাহা নাই, বাষ্পে কি তাহা পাওয়া যায়? দুগ্ধে যাহা নাই, ঘৃতে তাহা কোথা হইতে আসিবে? কই কাঁকড় পেষণ করিয়া ত কেহ তৈল বাহির করে না? জল হইতে ত ঘৃত উৎপন্ন হয় না। উহার উত্তরে হয়ত আপনারা বলিবেন, "বল কি? কারণে যাহা নাই কার্য্যে তাহা থাকে না? তুমি এমন কোন জিনিষ কি দেখ নাই যে যাহা কারণ হইতে স্বতন্ত্র? Hydrogen ও Oxygen একত্র করিলে যে জল পাওয়া যায় তাহা কি তুমি দেখ নাই? চূণ ও হলুদ একত্র করিলে যে লাল রং উৎপন্ন হয় তাহাও কি দেখ নাই? আর দেখ দেখি সৌন্দর্য্যবিহীন মৃত্তিকা হইতে কেমন সুন্দর ফুলের আবির্ভাব হয়? এখনও কি বলিবে কার্য্য কারণ হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না? এখনও কি বলিবে যে কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা থাকিতে পারে না? ঠিক কথা! এসকল দৃষ্টান্ত হইতে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, কার্য্য কারণ হইতে স্বতন্ত্র উপাদান লাভ করিতে পারে অর্থাৎ কার্য্য কতগুলি নূতন ধর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে মানিয়া লইব যে দেহরূপ জড়পিণ্ড হইতে জ্ঞানশক্তি ও প্রেমশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এখন দেখা যাউক জলের মধ্যে এমন কোন জিনিষ পাওয়া যায় কি না যাহা Hydrogen

এবং Oxeygenএর মধ্যে নাই। কই বিজ্ঞান ত সেকথা বলে না? বিজ্ঞান ত চোখের উপর দেখাইয়া দেয় যে Hydrogen ও Oxygenএর একত্র সংযোগ করিতে পারিলেই জল প্রস্তুত করা যায়। আবার 'জলকে তাড়িৎ শক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করিলেই Hydrcgen ও Oxygen পাওয়া যায়। তবে কি করিয়া বলিব যে জলে এমন কোন ধর্ম্ম আছে যাহা Hydrogen ও Oxygenএর মধ্যে নাই। জলে যদি এমন কিছু থাকে তাহা এ দুটী ব্যতীত অন্য কারণের সংযোগে। যেমন লবণ ও ধাতব পদার্থ ইত্যাদি। জলের বর্ণ ত সূর্য্যকিরণ হইতেই আসে। তারপর চূণ হলুদের কথা। চূণের বর্ণ শ্বেত। কিন্তু এই শ্বেতবর্ণ যখন হরিদ্রার বর্ণের সহিত একত্র হয় তখন এক স্বতন্ত্র বর্ণের উৎপত্তি হয়। দুয়ের মিশ্রণে যাহা আশা করা যায় তাহা হইতে এক স্বতন্ত্র জিনিষ দেখা দেয়। একবার দেখা যাক্ ইহার মধ্যে কি রহস্য রহিয়াছে। বিজ্ঞান বলিতেছে—বর্ণ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে তাহার প্রক্রিয়া এই—প্রত্যেক বস্তুর অণুর মধ্যে একপ্রকার কম্পন রহিয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে এ কম্পন অনুভব করা যায় না, তাহা নহে। এই আণবিক গতি (moleculer vibration)Ether নামে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে কম্পন উৎপাদন করে। সেই কম্পন গিয়া যখন আমাদের চোখে পঁহুছে তখন আমাদের সেই বস্তুর বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে! এরূপে দেখা যাইতেছে যে এক সমগ্র বস্তুর কম্পন যেমন বায়ুর সাহায্যে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া শব্দ বলিয়া একটা জ্ঞান জন্মায়, বস্তুর আণবিক কম্পনও তেমনই Etherএর সাহায্যে বর্ণ বলিয়া একটা বোধ জন্মায়। চূণের অণুতে একপ্রকার কম্পন আবার হরিদ্রার অণুতে আর একপ্রকার কম্পন রহিয়াছে। ইহাতেই ইহাদের বর্ণগত পার্থক্য। আবার চূণ ও হরিদ্রা

যখন মিলিত হয় তাহাতে একটা স্বতন্ত্র মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই মিশ্রপদার্থের আণবিক কম্পন উক্ত উভয়বিধ পদার্থের আণবিক কম্পন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহাতেই Etherএর মধ্যে স্বতন্ত্র একপ্রকার কম্পন (vibration) জন্মিয়া থাকে। এবং তাহাতেই এই মিশ্র পদার্থের একটা স্বতন্ত্র বর্ণ আমাদের বোধগম্য হয়। কই ইহাতে ত নূতন কিছুই পাইলাম না। দুইপ্রকার কম্পন একত্র হইয়া স্বতন্ত্র একপ্রকার কম্পন উৎপন্ন করিল—এইমাত্র বুঝা গেল। মনে করুন এক খণ্ড প্রস্তরে রজ্জু বাঁধিয়া টানিতে লাগিলাম, আমার গায়ের জোরে প্রস্তরখণ্ড আমার গায়ের দিকে আসিতে লাগিল। প্রস্তরখানির অন্য দিকে আর একটা দড়ি বাঁধিয়া অন্য একজন তুল্যশক্তিতে টানিতে লাগিল তখন প্রস্তরখানি সম্ভব হইলে অন্যদিকে চলিতে থাকিবে। তা না হয় স্থির হইয়া থাকিবে। এখানে যেমন দুই শক্তির সংযোগে একটা পৃথক্ ফল উৎপন্ন হইল, চূণ ও হলুদের মিশ্রণেও তাহাই হইল। কে বলিল শুধু মৃত্তিকা হইতে ফুল হয়? মৃত্তিকার গন্ধ, জলের সরসতা ও কোমলতা, এবং সূর্য্যের কিরণ হইতে বর্ণ আসিয়া ফুলের সৃষ্টি করে। ফুলের মনোহর গন্ধ ও বিচিত্র বর্ণ এরূপেই ত উৎপন্ন হয়।

যাহা হউক উপরিউক্ত দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে কার্য্যে কারণ হইতে স্বতন্ত্র কিছুই থাকিতে পারে না। এমন ত কই কিছু প্রমাণিত হইল না, যে কার্য্যের ধর্ম্ম কারণ ধর্ম্ম হইতে উৎপত্তির সময় একটা নূতন উপাদান লাভ করিয়াছে। দুই জড় বস্তুর মধ্যেই যখন ইহা প্রমাণিত হইল না, তখন কি করিয়া বলা যায় যে জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে চৈতন্য তাহার উৎপত্তি জড় পদার্থ হইতেই হইয়াছে? কাজেই জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

মানুষের বুদ্ধি, প্রেম, আত্মজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি ত দূরের কথা। তবে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে চৈতন্য হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি। অর্থাৎ যে আদ্যাশক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা অচেতন নহে। যখন তাহা হইতে জীবন, জ্ঞান, প্রেম, আত্মজ্ঞান প্রভৃতির উৎপত্তি হইতেছে তাহা সেই সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট।

অন্য ভাবে চিন্তা করিলে ইহা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইবে যে চৈতন্যই জড়ের মূলে, জড় চৈতন্যের মূলে, নহে। যে কোন একটি জড় বস্তুকে বিশ্লেষণ করিলে যে সংহত গুণাবলী (correlated elements) পাওয়া যায় তাহা চৈতন্যসাপেক্ষ। কোন না কোন জ্ঞান বা বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব না থাকিলে ইহার গুণাবলীর কোন অর্থই থাকে না। একখানি প্রস্তরকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহাহইলে পাওয়া যায় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, কাঠিন্য বর্ণ ইত্যাদি। মোটামোটি দুটি গুণ (attributes) পাওয়া যায়। সে দুটি ব্যাপকতা (extension) এবং বাধা দেওয়ার ক্ষমতা (resistence). কারণ আর যাহা যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা এ দুটি গুণেরই রূপান্তর। সে যাহা হউক এখন একবার ভাবিয়া দেখুন উপরি উক্ত গুণগুলি জীব-সাপেক্ষ কি না। এইগুলির প্রত্যেকটি কি আমাদের মনের এক একটা ভাব বা ধারণা (idea) নহে? কাঠিন্য বলিয়া একটা ভাবের সৃষ্টি হয় মানুষের মনে। বিস্তৃতি বলিয়া যে একটা ভাব জন্মে সেও ত মানুষের মনে। কোন গুণটী আমাদের মন হইতে স্বাধীন নহে। একটা জিনিসকে কঠিন বলিয়া উপলব্ধি করিবার যদি কেহ না থাকে, বস্তুর কাঠিন্যের কি কোন অর্থ থাকে? একটা জিনিস যে কোন স্থান পূর্ণ করিয়া আছে ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য যদি কেহ না থাকে, তবে কি বিস্তৃতি বলিয়া একটা গুণ থাকিতে পারে? একটা জিনিসের শব্দ গ্রহণ করিবার

জন্য যদি কেহ না থাকে তবে ইহার অস্তিত্ব কিসে সম্ভব হইবে? ইহার উত্তরে কেহ হয়ত বলিবেন, আচ্ছা যদি বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের চিন্তাতেই হইল, তবে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ত কই তাহার জ্ঞানগোচর বস্তুসমূহ অপসৃত হয় না? অর্থাৎ মনে করুন আমার সম্মুখে একখানি টেবিল রহিয়াছে। আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত টেবিলখানির নিকটে আছি ততক্ষণ টেবিলখানির অস্তিত্ব আমার জ্ঞানে; অর্থাৎ ইহার বর্ণ (colour) কাঠিন্য, (solidity) দৈর্ঘ্য, বেধ, গুরুত্ব ইত্যাদি আমার জ্ঞানের বিষয়রূপে অবস্থিত। এখন যদি আমি স্থানান্তরে চলিয়া যাই আমি ত আমার মনের ভাবসমূহ (mental ideas) লইয়াই প্রস্থান করিব। আমার মনের ভাব ত আমার সঙ্গেই থাকিবে, কিন্তু কই টেবিলখানিত আমার সঙ্গে সঙ্গে যায় না? অর্থাৎ আমি ত কই যেখানে সেখানে প্রকৃত টেবিলখানিকে দেখিতে পাই না? অবশ্য আমি স্মৃতি ও কল্পনার সাহায্যে ইহার একটী মনোময় ছবি যেখানে সেখানে অঙ্কন করিতে পারি, কিন্তু তাহা ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, ইহা ত শুধু পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি মাত্র। আর এক কথা টেবিলখানির অস্তিত্ব যদি শুধু আমার মনেই হইত তাহা হইলে আমি অন্যত্র চলিয়া গেলে টেবিলখানি যে পূর্ব্বোক্ত স্থানে রহিয়াছে এ ধারণা আমার আর আসিত না। কিন্তু এধারণা আমাদের ত সর্ব্বদাই থাকিয়া যায়। আমাদের ত মনে হয় টেবিলখানি পূর্ব্বোক্ত স্থানেই রহিয়াছে। কারণ আমি যখনই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসি ইহাকে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে রহিয়াছে দেখিতে পাই। অন্য একজন আসিয়াও ইহাকে সেই স্থানে দেখে। অবশ্য স্থানান্তরিত হইলে সেটা ভিন্ন কথা। সত্যই টেবিলখানি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায় না। আবার পূর্ব্বস্থানে রহিয়াছে এই যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহারও কারণ আছে। ব্যক্তিগত ভাবে তোমার আমার ন্যায় জীবের জ্ঞানে টেবিলখানি

সর্ব্বদা থাকিবে, একথা কেমন করিয়া বলি? কিন্তু তোমার আমার চিন্তায় না থাকিলেই যে ইহা জ্ঞান শক্তি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে রহিয়াছে একথা কে বলিল? তোমার আমার জ্ঞান ব্যতীত যদি জগতে অন্য কোন জ্ঞান না থাকিত তবে উক্ত আপত্তি অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইত। মানুষের ক্ষুদ্রজ্ঞান ছাড়া এমন এক জ্ঞানময়ী শক্তি রহিয়াছে, যাহা সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। তোমার আমার জ্ঞান এখানে থাকিলে ওখানে নাই, ওখানে থাকিলে এখানে নাই, কারণ ইহা আমাদের শরীরের সহিত সম্বদ্ধ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানময়ী মহাশক্তি সর্ব্বত্র সমভাবে থাকিয়া নিখিল জগতের যাবদীয় বস্তুসমূহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তোমার আমার অস্তিত্ব ঘুচিয়া গেলেও সকল বস্তু এই মহাজ্ঞানে অবস্থিতি করিতে পারে। এই জ্ঞান নিখিল জগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। প্রতি বস্তু, প্রতি জীব, প্রতি অণু, প্রতি পরমাণু এই মহাজ্ঞানে অবস্থিতি করিতেছে। তোমার আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান যখন কতকগুলি অবস্থার (conditions) মধ্য দিয়া আসিয়া এই মহাজ্ঞানের সঙ্গে এক হইয়া যায়, তখনই ইহার বিষয়ে বিষয়ী হইয়া দাঁড়ায়। তখন এই মহাজ্ঞানের বস্তুসমূহকে আত্ম অধিকারে লাভ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান কৃতার্থ হইয়া যায়।

বাস্তবিক, জগতে জড় শক্তি বলিয়া এমন একটা অদ্ভুত জিনিস কোথাও নাই। যে শক্তির লীলা বহির্জ্জগতে সর্ব্বত্র দেখা যায়, সে শক্তি সজ্ঞান, সে শক্তি চৈতন্যময়ী। তুমি আমি ইহাকে জড় শক্তি বলিয়া ধরিয়া লই, তাহার কারণ এই শক্তি চিরদিন একভাবে কাজ করে। ক্ষুদ্র মানুষের আইন কানুনের ন্যায় ইহার আইন কানুন কখনও বদলায় না। ইহার সৃষ্টির পদ্ধতি (programme) পূর্ণজ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া চিরদিন এক ভাবেই থাকে। আমরা যাহাকে মাধ্যাকর্ষণ

বলি, ইহাও এই সজ্ঞান শক্তিরই কার্য্য। শূন্যে কোন বস্তু অবলম্বনহীন হইয়া থাকিলে তাহা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়া ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়িবে এই যে নিয়ম ইহারই নাম মাধ্যাকর্ষণ। বৃহত্তর বস্তু ক্ষুদ্রতর বস্তুকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিবে ইহা এই মহানীতিরই রূপান্তর মাত্র। ইহা সেই সজ্ঞান মহাশক্তির সৃষ্টিকার্য্যের ও সৃষ্টি রক্ষার একটা অলঙ্ঘ্য নীতি। লৌহ চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হইবে, ইহাও তাহার আর একটী প্রক্রিয়া। এরূপে অসংখ্য নিয়মাবলীর অনুবলে এই সজ্ঞান শক্তি জগৎ শাসন করিতেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই এ সকল পরিবর্ত্তন ইহার ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হয়। শুধু কি ইহাই? একবার ভাল করিয়া বহির্জ্জগতের কথা চিন্তা করুন দেখি; ইহার মধ্যে কি কৌশল ও রচনানৈপুণ্য রহিয়াছে! বৃক্ষলতায়, পত্রপুষ্পে, গিরি নদীতে প্রকৃতিকে কেমন সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে! একবার শান্তভাবে নৈশগগনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, কি সুন্দর রচনা! একবার বিজ্ঞানের সাহায্যে এই নক্ষত্রপুঞ্জের কথা চিন্তা করুন, গ্রহের পর গ্রহ, সৌর জগতের পর সৌর জগৎ, কি সুন্দর ভাবে সাজান রহিয়াছে! যতই চিন্তা করিবেন ততই বিস্ময়সাগরে ডুবিবেন। কি অপার রহস্য! কি অপরিসীম ক্ষমতার পরিচয়!

উদ্ভিদ্-জগতে একবার আসুন। কি সুন্দর কৌশল! বৃক্ষটীকে সৃজন করিতে হইবে, তাই একটী ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে তাহার উপাদান-গুলি রক্ষা করা হইল। কি কৌশলে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপাদান-গুলি একটী অণু-পরিমাণ বীজের মধ্যে রক্ষিত হইল ইহাত আমাদের ধারণার অতীত। বায়ু, আলোক ও মৃত্তিকার রসের অনুবলে কেমন করিয়া ক্ষুদ্র বীজটী ক্রমে ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষে

পরিণত হয়! একটী বৃক্ষের কাণ্ডে, পত্রে, পুষ্পে কি রচনাকৌশল না রহিয়াছে!

তারপর একবার জীবজগতে আসুন। এখানকার ব্যাপার আরও অদ্ভুত! আরও বিচিত্র! কেমন সংযোজন! কেমন শৃঙ্খলা! উদ্দেশ্য ও উপায়-নির্ব্বাচনে কি কৌশলের পরিচয় না রহিয়াছে! এমন কোন ব্যবস্থা নাই যাহা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন। মৎস্যকে জলে বিচরণ করিতে হইবে—তাই তাহার শরীরটা হাল্‌কা করিয়া সৃজন করা হইল। ইতস্ততঃ সঞ্চরণের জন্য উপযুক্ত কলকৌশল দিয়া সৃজন করা হইল। পক্ষীকে আকাশে বিচরণ করিতে হইবে—তাই তাহার দেহটী তদনুসারে গঠিত হইল। পশুজাতি ও মনুষ্যজাতি স্থলে বাস করিবে—তাই তাহাদের শরীরের গঠন তদনুযায়ী হইল। এ সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, যে মহাশক্তি এ সকল সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে তাহা অপার বুদ্ধি ও কৌশলসম্পন্ন। নতুবা উদ্দেশ্য অনুযায়ী এমন সুন্দর উপায়-নির্ব্বাচন দেখা যাইত না। তারপর কি করিয়া এই সৃষ্টির প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ণভাবে চলিবে তাহার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র স্ত্রী-পুরুষের শ্রেণী বিভাগেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার সৃষ্টিকে গুণভেদে কেমন করিয়া উচ্চ ও নিম্নস্তর ক্রমে সাজান হইয়াছে। উদ্ভিদ জন্তুগণের জীবনধারণের উপায়। আবার উদ্ভিদ ও জন্তুগণ উচ্চতর জীব মানবগণের জীবনের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। মানবসমাজকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। পশু পক্ষীর ন্যায় মানুষের মধ্যে প্রকৃতি ও আকারগত কত বৈষম্য রহিয়াছে। ইহাতেই মানুষ বিভিন্ন জাতি ও সমাজে স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত হইতেছে। এরূপ আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত

রহিয়াছে যদ্দ্বারা স্রষ্টার অপার কৌশল বা বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জনষ্টুয়ার্ট মিল নিরীশ্বরবাদিগণের আদর্শস্থানীয়। কিন্তু উল্লিখিত সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাকেও এক প্রকার স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সৃষ্টির মূলে এক জ্ঞানশক্তি রহিয়াছে। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন :—'I think it must be allowed that in the present state of our knowledge, the adaptations in Nature afford a large balance of probability in favour of creation by intelligence."

এক্ষণে একবার মানবজীবনের বিষয় চিন্তা করা যাক্। ইহা কি অদ্ভুত জিনিস! সেই জ্ঞানময় পুরুষের কি অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র! মানুষের জীবনে যে জ্ঞানশক্তির সম্যক্ বিকাশ লাভ করিয়াছে অন্য কোথাও তাহা হয় নাই। মাতৃগর্ভে উৎপত্তি হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক একটী মানবজীবন কি অপার রহস্যে পরিপূর্ণ! মাতৃগর্ভে মানববুদ্ধির অগোচরে কোন্ শক্তি সেই ভ্রূণকে রক্ষা করে? দশমাস ধরিয়া ভ্রূণ জীবনে কি কি অবস্থান্তর ঘটে, একটীবার যাঁহারা ধাত্রীবিদ্যার এই অংশটুকু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এস্থলে সে সব উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কি সুন্দর ব্যবস্থা! কোন্ মাসে কোন্ অবস্থায় থাকিলে ভ্রূণের জীবনরক্ষা পাইতে পারে এবং দিন দিন ইহা পরিপুষ্টিলাভ করিতে পারে—কে তাহা জানে? অথচ মানবজ্ঞানের অগোচরে কোন্ মহাজ্ঞান তার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে? মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির উপর সে ভার ন্যস্ত হয় নাই। কারণ তাহা হইলে সব পণ্ড হইয়া যাইত। তাই সেই পূর্ণ জ্ঞান-শক্তি

সে কাজ নিজ হাতেই সমাধা করিতেছেন। তারপর ক্ষুদ্র শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইল। কিন্তু কে তাহাকে অমন করিয়া মাতৃস্তন হইতে দুধ টানিয়া বাহির করিতে শিখাইল? কিরূপ ভাবে চুষিলে দুধ বাহির হইবে কে তাহাকে দেখাইয়া দিল? ইহা কি সেই জ্ঞানময়ী শক্তির ক্রিয়া নহে? ক্ষুদ্র শিশুর এমন সাধ্য নাই বুদ্ধি করিয়া এই প্রণালীটি আবিষ্কার করে। অথচ ইহা না হইলে তাহার জীবনরক্ষা অসম্ভব। তাই সেই জ্ঞানশক্তি শিশুর মুখদ্বারা এই ক্রিয়াটি নিজেই সম্পন্ন করিয়া দিতেছে।

তারপর মানুষের দেহযন্ত্রটার কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। কি বর্ণনাতীত ব্যাপার! কত কল-কৌশল! কি করিয়া ভুক্তদ্রব্য দন্ত দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া পাকস্থলীতে যাইতেছে। সেখানে আবার কত কাণ্ড চলিতেছে। কেমন করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে পাচক রস আসিয়া সেই ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাক করিতেছে। তাহা হইতে কি অপূর্ব্ব প্রক্রিয়াতে রক্তের উৎপত্তি হইয়া তাহা আবার বিভিন্ন শিরাদ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হইতেছে। শরীরের যে অংশে যাহা দরকার তাহা সে অংশে যাইতেছে। কি অপূর্ব্ব ভাবে সেই রক্ত মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হইয়া তাহার স্নায়ুগুলিকে সতেজ ও কর্ম্মশীল করিয়া তুলিতেছে। কি কৌশলে আবার সেই রক্ত হইতে মাংস, অস্থি, মজ্জা, ইত্যাদির উৎপত্তি হইতেছে। কে এ সকল বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে? বিজ্ঞান কি ইহার অন্ত করিতে পারিয়াছে? 'আবার কেমন ব্যবস্থা! এ সকল যন্ত্রের পরিচালনভার মনুষ্যের ক্ষুদ্র বুদ্ধির উপর ন্যস্ত হয় নাই। সমগ্র প্রক্রিয়াটী সেই জ্ঞানময়ী শক্তি নিজ হাতেই রাখিয়াছেন। কারণ

মানুষের জীবন মরণ এইখানে। যে জায়গায় একটু গোল হইলেই আর রক্ষা নাই, সে জায়গায় কি করিয়া ক্ষুদ্র মানববুদ্ধিকে নিযুক্ত করা যায়? তাই মানুষকে সে অধিকার দেওয়া হয় নাই। মানুষ আপনার দেহের ভিতর কি কাণ্ড চলিতেছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তারপর মানুষের ইচ্ছাসম্পন্ন কার্য্য। মানুষ আপনার শারীরিক ও মানসিক অভাব সকল পূর্ণ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় কত কাজ করে তাহা ত কাহারও অবিদিত নাই। যেখানে উদ্দেশ্য ও উপায় মানুষের সম্পূর্ণ জ্ঞানগোচর তাহাই মানুষের ইচ্ছাসম্ভূত কার্য্য। মানুষ ক্ষুধা পাইলে খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ করে, তৃষ্ণা হইলে জলপান করে। ইহা তাহার জ্ঞানপ্রসূত ক্রিয়া। তারপর অধ্যয়ন, অধ্যাপন, আত্মচিন্তা, ধর্ম্মচিন্তা, সমাজ-নীতি, রাজ-নীতি প্রভৃতিতে মানুষ চিরদিন আপনার জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক্তি প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সেই জ্ঞানময়ী শক্তির কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? মানুষকে এত বুদ্ধি আর কে জোগাইবে? মানুষের জন্য এত ব্যবস্থা আর কে করিবে?

মানুষের জীবনে আর এক প্রকার কার্য্য রহিয়াছে,—সে অভ্যাস-জনিত কার্য্য। যেমন পথ চলা, কাপড় পরা ইত্যাদি। ক্ষুদ্র শিশু যখন প্রথম প্রথম পায়ে হাঁটিতে শেখে, তখন কত আয়াস, কত সাবধানতা প্রকাশ পায়। তখন ইহা জ্ঞান ও ইচ্ছাকৃত কার্য্য থাকে। পরে পায়ে হাঁটা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহাতে আর সব সময় জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রয়োগ করিতে হয় না। একজন পথ চলিতে চলিতে কত লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছে, কত কি চিন্তা করিতেছে, মস্তিষ্ক অন্য বিষয়ে নিযুক্ত, অথচ পথ চলার কোন ব্যাঘাত হইতেছে না।

কাপড় পরার বেলাও ঠিক তাই। এই ব্যবস্থার মধ্যে কি কোন কৌশলের পরিচয় নাই ? সকল কাজ যদি সমস্ত মস্তিষ্ক খাটাইয়া করিতে হয়, ইহা অকালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। তাই কতকগুলি কাজের ভার মস্তিষ্কের এক নিকৃষ্ট অংশের (cerebellum) উপর ন্যস্ত হইল। কি অপূর্ব্ব ব্যবস্থা !

মানুষ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানক্রিয়াসমূহ হইতেই এক বুদ্ধিমতী শক্তির অস্তিত্বে উপনীত হয়। বহির্জ্জগতে মানুষ যে জ্ঞানময়ী শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করে তাহা তাহার পরোক্ষ জ্ঞান। এ সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আত্মতত্ত্বেই হইয়া থাকে। আপনার ইচ্ছাকৃত কার্য্যের মধ্যেই মানুষ উদ্দেশ্য ও উপায়-নির্ব্বাচন দেখিতে পায়। ইহা হইতে যে বুদ্ধি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, মানুষ তাহাই বিরাট্ আকারে বহির্জ্জগতে আরোপ করে। মনে করুন বাগানে একটী ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে ; ইচ্ছা হইল, একটু পরিশ্রম করিয়া ফুলটী তুলিয়া লইলাম। কে বলিবে যে এটী অন্ধশক্তির কার্য্য ? কে বলিবে যে এই ব্যাপারটী সম্পূর্ণ আকস্মিক (accidental) ? আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি ইহাতে আমার জ্ঞান ও ইচ্ছা রহিয়াছে। জ্ঞানের পরিচয়—উদ্দেশ্য ও উপায়-নির্ব্বাচনে। এস্থলে উদ্দেশ্য হইল ফুলটী তোলা আর উপায় হইল একটু হাঁটিয়া গিয়া হাতখানিকে খাটান। আবার ইচ্ছার পরিচয়—শক্তির প্রয়োগে। এই জন্যই মানুষ বহির্জ্জগতে যখন উদ্দেশ্য ও উপায়-নির্ব্বাচন দেখিতে পায়, বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ উপায় নির্ব্বাচন পূর্ব্বক শক্তির প্রয়োগ দেখিতে পায় তখনই এক জ্ঞানময়ী ও বুদ্ধিমতী শক্তির সত্তায় গিয়া উপনীত হয়। ইহা পূর্ব্বে একবার বিস্তৃতভাবে দেখা গিয়াছে।

এক্ষণে দেখা গেল যে সৃষ্টির অন্তরালে যে মহাশক্তি কার্য্য করিতেছে

তাহা জ্ঞানময়ী ও ইচ্ছাময়ী। কিন্তু শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইল না। এই শক্তিতে প্রেমও রহিয়াছে। মানবজীবনে প্রেমের বিকাশ দেখিয়াই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রেমের বিকাশ যদি দেখিতে চাও সর্ব্বাগ্রে নারী-জাতির কথা চিন্তা কর। নারীদেহ যেন অতি কোমল উপাদানে গঠিত। একটু বেশী শ্রমসাধ্য কাজ করিতে হইলে কুসুমকোমল দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু শিশুর যত্ন ও সেবার জন্য মা কি না সহ্য করিতে পারেন? একবার আপনার কোলের শিশুটি অসুস্থ হইয়া পড়ুক্, মায়ের দেহে বল যেন আর ধরে না। সারাদিন খাটিয়াও যেন আর অবসাদ নাই। বলুন দেখি মায়ের কোমল দেহে এত বল কোথা হইতে আসে? তারপর স্বামীর সুখের জন্য, সেবার জন্য নারী যত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, কে আর তেমন করিতে পারিয়াছে? একবার মানবজাতির ইতিহাসখানি পড়িয়া দেখুন ইহাতে নারীপ্রেমের কত কাহিনী বিবৃত রহিয়াছে। অই যে রাজ-কন্যা রাজ-বধূ বৈদেহী জীবনের সকল সুখ-সম্ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বনে বনে ফিরিলেন, কে তাঁহাকে এমন কঠিন ব্রতে নিযুক্ত করিল? রামচন্দ্র কত বুঝাইলেন, পুরনারীগণ কত ভয় দেখাইলেন। সীতা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি যে পতিগতপ্রাণা! পতির জন্য অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন, সুখসম্ভোগ ত দূরের কথা। বনে গিয়া ত কত কষ্ট সহ্য করিলেন, কই একটী দিনের জন্যও ত সীতা বলিলেন না—'কেন অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া বনে আসিলাম!' কে দিল তাঁহার দেহ ও মনে এত বল? এ কি সেই প্রেমের বল নহে? সাবিত্রীর উপাখ্যান কে না জানে? এত দূরেই বা যাইতে হইবে কেন?

তোমার আমার প্রতিজনের গৃহে কি এই অপার্থিব প্রেমের লীলা দেখিতে পাই না ? যেখানে নারী আছে সেখানেই এই প্রেমের অভিনয় রহিয়াছে। স্বামীর কল্যাণের জন্য, সুখ-শান্তির জন্য স্ত্রী কি না বিসর্জ্জন করিতে পারে?

প্রেমের কথা বলিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে নারীজাতির কথা বলিলাম। কারণ পুরুষ যেমন জ্ঞান ও কর্ম্মবলে বলীয়ান্, নারী তেমনই হৃদয়ের বলে অপরাজেয়া। তাই বলিয়া পুরুষের হৃদয়ে প্রেম যে নিতান্ত কম তাহা নহে। পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, ধর্ম্মের জন্য পুরুষ যে এত সহ্য করে, সে কি প্রেমের বলে নহে? ইতিহাসে ইহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। অই যে শাক্যসিংহ সোণার সিংহাসন দূরে ফেলিয়া, ভোগৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া পথের কাঙ্গাল সাজিলেন, এ কিসের জন্য? জরা ও ব্যাধিপ্রপীড়িত নরনারীর দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আর ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত থাকিতে পারিলেন না। সব ছাড়িয়া অরণ্যে ছুটিলেন। পরিশেষে নিত্য সুখের একমাত্র প্রস্রবণ নির্ব্বাণধর্ম্মের প্রচার করিয়া নরনারীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিলেন। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের কথা কে না জানে! নরনারীকে প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষা দিবার জন্য তিনি সংসারের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিলেন। নিজের কুল-মর্য্যাদা ভুলিয়া আচণ্ডাল সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রেমিক ঈশা পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া নরনারীকে স্বর্গীয় পিতার প্রেমসুধা বিলাইবার জন্য আজীবন মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে ক্রুশে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রেমের পরীক্ষায় জয়লাভ করিলেন। স্বর্গীয় পিতাকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, মানুষকে তাহা শিখাইয়া গেলেন। এত দূরেই বা যাইতে হইবে কেন? আমাদের প্রতিদিনের কার্য্যগুলি কি প্রেমের সাক্ষ্য দিতেছে

না? মানুষ ত পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য প্রতিদিন শরীরের রক্ত জল করিয়া খাটিতেছে। প্রেমের ইতিহাস ফুরাইবার নহে। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে সৃষ্টির অন্তরালবর্ত্তিনী মহাশক্তি প্রেমের প্রস্রবণ-রূপিণী। অনাদি কাল ধরিয়া সেই অনন্ত প্রেমের উৎস হইতেই মানব-হৃদয়ে প্রেমরাশি উৎসরিত হইতেছে।

এক্ষণে বুঝা গেল, যে মহাশক্তি হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা এই তিনটীই রহিয়াছে। সৃষ্টিতে যখন এই তিনটীরই এত প্রমাণ রহিয়াছে, তখন তাহার কারণরূপিণী সেই আদ্যাশক্তিতে ইহা ত থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং ইহাকে আর অন্ধশক্তি বলিবার যো নাই। তবে কেন আর বৃথা বাক্যজালে আবদ্ধ হইয়া দিশাহারা হইতেছি? কেন আর গায়ের জোরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজেই প্রতারিত হইতেছি? এখন সরল ভাবে বলুন বিশ্বে এত লীলা অন্ধশক্তি হইতে সম্ভব নহে। একবার সন্দেহের অন্ধকার দূর করিয়া উপনিষদের সেই প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ঋষির সহিত একবাক্যে বলুন,—"আমি অন্ধকারের পরপারে সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে দেখিয়াছি।" একবার প্রাণ খুলিয়া বলুন,—

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।"—কঠোপনিষদ্।

আর বলুন তিনিই আমাদের—

"গতি র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥" গীতা ৯ম অঃ—১৮ শ্লোক।

ঈশ্বর ও জগৎ।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা বিভিন্নশ্রেণীর নিরীশ্বরবাদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। প্রথমতঃ জড়বাদের সমালোচনায় দেখা গেল যে, জড় পরমাণু বা অন্ধ শক্তি হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি অসম্ভব। এক সজ্ঞান ইচ্ছা শক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঘটনাবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের সমালোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, এক অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানময় সত্তা ভিন্ন ঘটনাবলীর প্রকাশই অসম্ভব। পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলী-সমন্বিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ এক চিরন্তন জ্ঞানময় সত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তজ্জন্য সেশ্বরবাদী দার্শনিকগণ জগতের কারণরূপী ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর জ্ঞানময়, প্রেমময় ও ইচ্ছাময়। এই জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাতেই জগতের স্থিতি এবং ইহাতেই জগতের পরিণতি। তাঁহারা শুধু ভগবৎ প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। কি করিয়া সেই প্রকৃতি হইতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভব হইল এবং বিশ্বের মধ্যে স্রষ্টার কৌশল ও উদ্দেশ্য কিরূপ ভাবে বিন্যস্ত তাঁহারা তাহারও সম্যক্ নির্দ্ধারণে ব্রতী। ভগবৎ প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য দুই নির্দ্দিষ্ট পথ রহিয়াছে। প্রথম পন্থা আত্মতত্ত্ব হইতে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়া। মানুষ আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়া পরমাত্মতত্ত্বে গিয়া উপনীত হয়। মানবাত্মা পরমাত্মার সম্পূর্ণ প্রকাশ, তাই মানবাত্মার বিশ্লেষণে পরমাত্মার সত্তা ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। এরূপে ব্রহ্ম প্রকৃতি নির্ণীত হইলে কিরূপে সেই প্রকৃতি হইতে অসীম বিশ্বের উৎপত্তি হইল তাহাও নির্ণয় করা যায়। দ্বিতীয় পন্থা বিশ্বতত্ত্ব হইতে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়া। বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলীর প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,

তাহার মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই কার্য্যকারণ বিচার হইতে ব্রহ্মসত্তায় উপনীত হওয়া দুষ্কর নহে। আবার বিশ্বের মধ্যে যে উদ্দেশ্য ও উপায়-নির্ব্বাচন রহিয়াছে, তদ্দ্বারা স্রষ্টার বুদ্ধিমত্তা ও অপার কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। কিরূপে আত্মজ্ঞান হইতে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় এবং কিরূপেই বা বিশ্বজ্ঞান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে বিভিন্ন প্রকার সেশ্বরবাদের আলোচনা উপস্থিত করার পূর্ব্বে আমাদিগকে আর একটী বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। এই বিষয়টী ভগবৎ প্রকৃতির পূর্ণতা লইয়া। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, জড়জগৎ ও জীবজগৎ পরিপূর্ণ করিয়া এক বিরাট্ জ্ঞানময়ী ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু এই বিরাট্ শক্তি যে এক পরিপূর্ণ জ্ঞানময়, প্রেমময় ও ইচ্ছাময় নিত্য পুরুষের বিরাট্ প্রকাশ, তাহার আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে একটু বিস্তৃত ভাবে এই বিষয়টীর অবতারণা করা প্রয়োজন। এই পূর্ণতার আবার দুটী দিক রহিয়াছে। এক সত্তার দিক্, আর এক নৈতিক মঙ্গলের দিক্। সত্তায় যিনি পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম এবং পূর্ণ ইচ্ছা, নৈতিক চরিত্রে তিনি পূর্ণ মঙ্গল। তিনি 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'।

সেণ্ট এন্স্‌লেমের মতে আমাদের প্রকৃতিনিহিত পূর্ণতাবোধের অনুযায়ী এক পূর্ণবস্তু নিশ্চয়ই রহিয়াছে, নতুবা নিজে অপূর্ণ হইয়া আমরা কিছুতেই এই পূর্ণতার জ্ঞানলাভ করিতে পারিতাম না। পূর্ণবস্তুর অস্তিত্ব ব্যতীত এই চিরন্তন ধারণার কোন অর্থই থাকে না। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডেকার্ট (Descartes) কিন্তু এত অল্পে নিবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার মতে পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ আছে তাহা ঠিক্, কিন্তু এই বোধ বা সংস্কারের অনুযায়ী বাস্তবিক এক পূর্ণবস্তু

আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের ধারণা আছে বলিয়াই যে পূর্ণবস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা বলিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। আমরা ত মনে করি যে সূর্য্য প্রাতঃ-কালে পূর্ব্বদিকে উদিত হয় এবং সারাদিন নভস্তল পরিভ্রমণ করতঃ সায়াহ্নে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। কিন্তু আমাদের এই ধারণা যে ভ্রান্তি-সঙ্কুল তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়াই ত আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া থাকে। এরূপে ইন্দ্রিয় সমূহ আমাদিগকে প্রতিনিয়ত প্রতারিত করিতেছে। সুতরাং পূর্ণবস্তুর অস্তিত্বের সংস্কার আমাদের ভ্রান্তমনোবৃত্তিসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। কারণ হইতে কার্য্য যে কখনও বড় হইতে পারে না ইহা ত অভ্রান্ত সত্য। কার্য্যের যখন কারণ হইতেই উৎপত্তি, কার্য্যের সমস্ত উপাদান কারণের মধ্যে নিশ্চয় নিহিত থাকিবে। মেঘের এক বিশেষ অবস্থা বৃষ্টিপাতের কারণ, কাজেই বৃষ্টির সমস্ত উপাদান মেঘের এই অবস্থার মধ্যেই থাকিবে। এই হিসাবে ধরিতে গেলে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, পূর্ণবস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে, তাহা আমাদের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে না। অপূর্ণ মনোবৃত্তি লইয়া আমরা পূর্ণ সত্তার ধারণা সৃষ্টি করিতে পারিব না। সুতরাং পূর্ণ সত্তার বোধ আমাদের প্রকৃতিনিহিত। আমাদের অস্তিত্বের সহিত ইহা অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। অন্য কথায় বলিতে গেলে যাহা হইতে আমাদের অস্তিত্ব বা সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে, ইহাও তাহা হইতেই সমুদ্ভূত। আবার এই যে পূর্ণতার ধারণা ইহা অভাবাত্মক নহে। আমরা অপূর্ণ বলিয়া ইহার বিপরীত যাহা কিছু তাহাই পূর্ণ মনে করি এ কথাও বলা যায় না। অপূর্ণ শব্দটাই অভাবাত্মক। অপূর্ণতার বোধ অপূর্ণতার

সহিত তুলনাসাপেক্ষ। পূর্ণবস্তু সম্বন্ধে আমাদের একটা পরিষ্কার জ্ঞান আছে বলিয়াই অপূর্ণ বৃত্তিসমূহকে আমরা অপূর্ণ বলিয়া চিনিতে পারি। সুতরাং যাহা সমস্ত অপূর্ণ বস্তুর অস্তিত্বের মূলে, যাহা যাবদীয় অপূর্ণ বস্তুর মাপকাটি তাহাই পূর্ণবস্তু। হয়ত অনেকে বলিবেন মানুষের সময়ের মধ্য দিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই মানুষ পূর্ণতাজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু যে পূর্ণতার জ্ঞান আমাদের প্রকৃতিনিহিত, তাহা ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জ্ঞান নহে। অর্থাৎ এই পূর্ণতা ত ভাবী পূর্ণতা নহে। এতএব বুঝা যাইতেছে যে আমাদের পূর্ণতার জ্ঞান কোন পূর্ণ শক্তি হইতে উদ্ভূত। এই পূর্ণ শক্তি আমাদের অপূর্ণ মানব প্রকৃতির অন্তরালে থাকিয়া প্রতি নিয়ত আমাদের প্রাণে এই ভাবটি জাগাইয়া রাখিতেছেন। এই পূর্ণ শক্তিই ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতি-পাদ্য ঈশ্বর। যেমন নদী ভিন্ন তট থাকিতে পারে না তেমনই পূর্ণবস্তুর অস্তিত্ব ভিন্ন পূর্ণতার বোধ থাকিতে পারে না।

আধুনিক দার্শনিকগণ এ বিষয়ে আরও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা আত্ম-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের সমন্বয়রূপী আত্মবস্তু দেশকালনিবদ্ধ অসম্পূর্ণ বস্তু নহে। ইহা সময়-নিরপেক্ষ অর্থাৎ সময়ে ইহার পরিবর্ত্তন নাই। ইহা কালের ঘাত-প্রতিঘাতের অধীন নহে। ইহা নিত্য, শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয়। আমাদের অপূর্ণ মনোবৃত্তি-সাপেক্ষ জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি যে সঙ্কীর্ণ বা অসম্পূর্ণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি স্বয়ং অসম্পূর্ণ বা সীমাবদ্ধ—এরূপ ধারণা আমরা করিতেই পারি না। তদ্রূপ প্রেম ও শক্তি নিজে অসম্পূর্ণ এ ধারণাও আমাদের কল্পনাতীত। একটু অভিনিবেশ সহকারে আত্মচিন্তা

করিলেই ইহা সহজে বুঝা যাইবে। এই আত্মবস্তু যদি সত্য না হয়, আমাদের অস্তিত্ব আরও মিথ্যা। কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা মোটেই সন্দিহান নহি। সুতরাং এই আত্মবস্তু যদিও মানব দেহের মধ্য দিয়া অপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে ইহা পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ ইচ্ছারূপী এক অখণ্ড শক্তি। এই অখণ্ড পূর্ণ শক্তিই বেদান্তের পূর্ণব্রহ্ম।

এই পূর্ণ সত্তার আর একদিক্ চরিত্রের পূর্ণতা (moral perfection). এই চরিত্রের পূর্ণতা আবার ইচ্ছা বা শক্তির পূর্ণতার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। ইচ্ছা যাঁহার পূর্ণ মঙ্গল, কার্য্যে তাঁহার আবিলতার সম্ভাবনা নাই। মানুষের কার্য্য অপূর্ণ ইচ্ছা হইতে সঞ্জাত। দেশ কাল সাপেক্ষ প্রবৃত্তি হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি তাহাতে পূর্ণ মঙ্গলের অস্তিত্ব অসম্ভব। তাই মানবচরিত্রের অপূর্ণতা আমাদের নিত্য অভিজ্ঞতার বিষয়। কিরূপে আমরা এই অপূর্ণ চরিত্রের ধারণায় উপনীত হইলাম, তাহা একবার আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন। কাহার তুলনায় আমাদের চরিত্র অপূর্ণ? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে আমরা পূর্ণ চরিত্রের ধারণা করিতে সক্ষম বলিয়াই ইহার তুলনায় মানব চরিত্রকে অপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমাদের অপূর্ণ কর্ম্মস্পৃহার সম্মুখে, অপূর্ণ চরিত্রের সম্মুখে পূর্ণ কর্ম্মরূপে পূর্ণ চরিত্রের এক নিত্য আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই আমরা আমাদের চরিত্রের অপূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারি। সাধুতা নিজে (Piety in itself) একটা দেশকালনিবদ্ধ বস্তু নহে। আমরা ক্রমশঃ পূর্ণ পবিত্রতার দিকে অগ্রসর হইতে পারি বটে, কিন্তু আদত পবিত্রতার একটা সীমা কল্পনা করা যায় না। এই পূর্ণ পবিত্রতাই স্বয়ং পূর্ণমঙ্গল পরব্রহ্ম। একদিকে তিনি 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্' অন্যদিকে 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।'

সেশ্বরবাদী দার্শনিকগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও ভগবৎ প্রকৃতির পূর্ণতা সম্বন্ধে সকলেই দ্বিধাশূন্য। সকলেই ভগবৎ সত্তায় পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণপ্রেম ও পূর্ণ ইচ্ছার সামঞ্জস্যে আস্থাবান্। শুধু তাহা নহে, এই পূর্ণপুরুষ যে পূর্ণমঙ্গলস্বরূপ এ সম্বন্ধেও তাঁহারা সংশয়-বিরহিত। এই পূর্ণমঙ্গল পূর্ণপুরুষই যে বিশ্বমূলে মহাশক্তিরূপে অবতীর্ণ ইহাও তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত বিশ্ব ও মানব জীবনের সম্বন্ধবিচার লইয়া তাঁহাদের মধ্যে উৎকট মতভেদ রহিয়াছে। বিশ্বের সহিত বিশ্বেশ্বরের, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধবিচার লইয়া স্মরণাতীত কাল হইতে দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে উৎকট বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিষয় লইয়া তাঁহারা প্রধানতঃ তিনটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথম সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, দ্বিতীয় সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদী এবং তৃতীয় সম্প্রদায় দ্বৈতা-দ্বৈতবাদী। কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায় আবার ক্রমবিকাশ নীতির অনুসরণে উন্নততর অবস্থায় উপনীত হইতেছেন। মানবজাতির অখণ্ড অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিজ্ঞানও উন্নততর অবস্থা লাভ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? প্রাচীন বহুদেববাদ দ্বৈতবাদে, এবং প্রাচীন দ্বৈতবাদ বর্ত্তমান বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে উন্নীত হইয়াছে। প্রাচীন অদ্বৈতবাদও বহু পরিমাণে মার্জ্জিত আকার ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বোপরি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ জ্ঞানবিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের যুগল-মিলন। ক্রমে ক্রমে আমরা এ সকল বিভিন্ন মতবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সর্ব্ব প্রথমে দ্বৈতবাদের আলোচনা উপস্থিত করিব। তৎপরে অদ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদে উপনীত হইব।

দ্বৈতবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বস্রষ্টা পরম পুরুষকে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে স্রষ্টা সৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া আপন পূর্ণ কর্ম্ম শক্তির অনুবলে জগৎ শাসন করিতেছেন। এই বিশ্ব প্রপঞ্চ স্রষ্টা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই অনাদি পুরুষ সৃষ্টির বহির্দ্দেশে অবস্থান করতঃ কতিপয় প্রাকৃতিক ও নৈতিক নিয়মের অনুবলে জগৎ শাসন করিতেছেন। তিনি জগৎ ব্যাপারের অন্তর্ভূক্ত নিত্য ক্রিয়াশীল শক্তি নহেন। পরন্তু এই শক্তি তাঁহারই সৃষ্টি। মানবজীবন যদিও তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং যদিও মানবাত্মা তাঁহারই আদর্শে গঠিত, তথাপি মানুষ তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করিতেছে। তাঁহার আদর্শে গঠিত বলিয়া মানব-প্রকৃতিতে ভগবৎ প্রকৃতির আভাস পাওয়া যায়। ইহাতেই মানুষের পক্ষে ভগবৎ প্রকৃতির অনুভূতি ও অনুশীলন সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা একদিকে বিশ্বপিতাকে স্রষ্টা ও বিধাতা বলিয়া জানি, অপর দিকে তাঁহাকেই নৈতিক জীবনের পূর্ণাদর্শ বলিয়া অনুভব করি। প্রাকৃতিক জগতের ন্যায় নৈতিক জগতেও তিনি তাঁহার কতিপয় অলঙ্ঘ্য নিয়মের অনুবলে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহার পূর্ণ ইচ্ছার অনুসরণ করতঃ কর্ম্মজীবন উদ্‌যাপন করাই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। অকৃত্রিম সাধুতার অনুবলে ভগবদিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করাতেই মানবজীবনের সার্থকতা। আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠান যে ফল প্রসব করে, তাহা হইতেই আমরা ভগবদিচ্ছা অনুভব করিতে পারি। আমাদের সুকৃতির ফল সুখময় ও শান্তিময়, দুষ্কৃতির ফল দুঃখময়, বিষাদময়। যে কর্ম্মের ফল মানবজীবনে ক্রমোন্নতির প্রতিকূল

তাহাই ভগবদিচ্ছার বিরোধী। যে কর্ম্ম জীবনবিকাশের অনুকূল তাহাই ভগবদিচ্ছা-প্রসূত। ভগবানের অভীপ্সিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধিত হয়। সুরাপানের পরিণাম শারীরিক ও মানসিক অবসাদ; চৌর্য্যবৃত্তি বা স্বার্থপরতার পরিণাম বিবেকের ভর্ৎসনা, চিত্তের সঙ্কোচসাধন, আত্মপ্রসাদের অভাব ও সামাজিক শাসন।

এই দ্বৈতবাদের মধ্যে নৈতিক আদর্শের যে প্রতিকৃতি দেখা যায় তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। সেশ্বরবাদী মাত্রই ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে দ্বৈতবাদিগণ যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ, যদি বিশ্বকে স্রষ্টা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলা যায়, তাহা হইলে ইহাই বলা হইল যে বিশ্ব সৃষ্টির মূল উপাদান ভগবৎ-সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র এমন কিছু আছে যাহার সাহায্যে তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। এস্থলেই ভগবৎ-সত্তার পূর্ণতা অস্বীকার করা হইল। যখন তাঁহার প্রকৃতির বাহিরে একটা স্বাধীন বস্তু থাকিতে পারিল, তখন তাঁহার সত্তা সীমাবদ্ধ হইয়া গেল। আর তাঁহার সত্তা সর্ব্বগ্রাসী হইতে পারিল না; ইহা সসীম ও সঙ্কীর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আত্মতত্ত্ব হইতে আমরা যে ভগবৎ প্রকৃতির পরিচয় পাই তাহা পূর্ণ, তাহা সর্ব্বগ্রাসী; তাহার বাহিরে একটী পরমাণুও থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বের পক্ষে যদি স্রষ্টা হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি সম্ভবপর হইল, ইহার মধ্যে যে শক্তির ক্রিয়া অবিশ্রান্ত চলিতেছে, তাহা ভগবৎ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রভাবে রহিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্ণ পুরুষের সত্তার বাহিরে এমন কোন শক্তি থাকিতেই পারে না। তৃতীয়তঃ,

আমরা মানবজীবন ও জড় জগতের ঘটনাবলীর অনুশীলন দ্বারাই ভগবৎ-সত্তায় উপনীত হই। ভগবৎ-প্রকৃতি জড়-জগতে ও নর জগতে অভিব্যক্ত বলিয়াই আমাদের পক্ষে ভগবৎ-প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভবপর হইয়াছে। নতুবা ভগবৎ-প্রকৃতি নির্ণয় করা দূরে থাকুক ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিবার আমাদের কোনই অধিকার নাই। চতুর্থতঃ, যদি জড় পদার্থ বলিয়া ভগবৎ-সত্তা হইতে পৃথক্ একটী বস্তুই রহিল, তবে ভগবানের এমন শক্তি নাই যে তাহার মধ্যে বিকৃতি ঘটাইয়া বিশ্বের সৃষ্টি করিবেন। জড় পদার্থের অস্তিত্ব মনোবৃত্তি-সাপেক্ষ। কোন জড়বস্তুকে বিশ্লেষণ করতঃ আমরা যে সংহত গুণাবলী লাভ করি তাহাদের প্রত্যেকটী এক একটী ভাবের (idea) নাম মাত্র।

প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে এই দ্বৈতবাদের অসঙ্গতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। খৃষ্টীয় সাধকদিগের মতে ভগবান্ স্বর্গধামে অবস্থিতি করিতেছেন। তথা হইতে কতকগুলি প্রাকৃতিক ও নৈতিক নিয়মের অনুবলে তিনি জগৎ নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই জড়জগৎ ও মানবজীবন তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র। তিনি ছয় দিন কাল সৃষ্টিব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন মাত্র। তবে প্রয়োজন অনুসারে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ইহার মধ্যে কোন কোন পরিবর্ত্তন সংসাধন করিয়া থাকেন। পাপীদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করতঃ পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি এক সময় খৃষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে উক্ত প্রকার দ্বৈতবাদ প্রায়ই দেখা যায় না। তাঁহারা সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী এই দুই সম্প্রদায়েই বিভক্ত। তবে বৈদিক বহুদেববাদের মধ্যে এবং পৌরাণিক ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে দ্বৈতবাদের উপকরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বেদের দেবতাগণ জগতের নিয়ন্তা ও বিধাতা। মানবজীবন তাঁহাদের সত্তার অন্তর্ভুক্ত নহে। তাঁহারা উপাস্য, মানুষ উপাসক। মানুষ যজ্ঞকর্ত্তা, দেবতাগণ ফলদাতা। পৌরাণিক দেবদেবীগণও মানুষের উপাস্য। তাঁহারাই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহাকে আপনাদের শাসনাধীন রাখিয়াছেন। মানুষ তাঁহাদের উপাসক। তাঁহারা মানুষের ভাগ্য-বিধাতা। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় বিভিন্ন দেবদেবীতে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমরা পৌরাণিক ধর্ম্ম নামে স্বতন্ত্র পুস্তকে বিস্তৃত আলোচনা উপস্থিত করিব। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পাশ্চাত্য দ্বৈতবাদ যেমন বিশ্বাতিরিক্ত স্বতন্ত্র ভগবৎ-সত্তা স্বীকার করে, পৌরাণিক ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহ তেমনই আপনাপন উপাস্য দেবতার বিশ্বাতিরিক্ত সত্তায় বিশ্বাস করেন। তবে ঐ সকল ধর্ম্মমত বহুস্থলে অদ্বৈতবাদের সহিত জড়িত। তজ্জন্য সর্ব্বত্র মতের শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, সে সকল আপত্তি এ সকল প্রাচ্য দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধেও তুল্যরূপে প্রযোজ্য।

এ দেশের বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মধ্যে শ্রীমন্‌মধ্বাচার্য্য আপনার বেদান্তভাষ্যে দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশস্থ একদল বৈষ্ণব তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্প্রদায় মাধ্ব সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত। মধ্বাচার্য্যের মতে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যগুলি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে একটা সাদৃশ্যের কথা ব্যক্ত করে মাত্র। নিত্য ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করাই এই সম্প্রদায়ের মুক্তির আদর্শ।

অদ্বৈতবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

অদ্বৈতবাদ বলিলেই বুঝা যায় যে ইহা দ্বৈতবাদের বিপরীত। দ্বৈতবাদিগণ বিশ্বকে স্রষ্টা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণ বিশ্ব ও স্রষ্টার মধ্যে কোন পার্থক্যই স্বীকার করেন না। দ্বৈতবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদিগণ অন্ধভাবে ইহার ঠিক্ বিপরীত দিকে ছুটিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আমরা যাহাকে বিশ্ব বলি তাহাই ঈশ্বর, আবার ঈশ্বরও বিশ্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবশ্য ইহা অভ্রান্ত সত্য যে এই গ্রহ নক্ষত্র পরিপূর্ণ অসংখ্য সৌর-মণ্ডল একমাত্র ব্রহ্মশক্তির উপরেই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে এবং নিত্য কর্ম্মশীল ব্রহ্মও প্রতিমুহূর্ত্তে এই অসীম সৃষ্টির মধ্য দিয়া আপনার সত্তাকে অভিব্যক্ত করিতেছেন। সুতরাং স্রষ্টা ও সৃষ্টি যে মূলে একই বস্তু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ এই সত্য হইতে অনেকদূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

দেশভেদে অদ্বৈতবাদ দুই পৃথক্ আকার ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে ভারতের বিখ্যাতনামা দার্শনিক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এ দেশে যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার আলোচনা উপস্থিত করিব। তৎপরে পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।
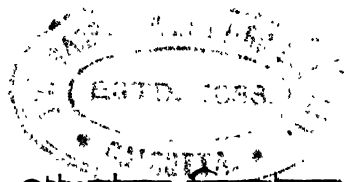
শঙ্করাচার্য্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদ।

জ্ঞানযোগী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের নাম জানেন না, এরূপ লোক বোধ হয় এদেশের শিক্ষিত সমাজে অতি অল্পই আছেন।* এদেশে তিনি শিবাবতার বলিয়া বিদিত। অনেকেই তাঁহার জ্ঞানগরিমার পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি অদ্বৈতবাদিগণের নেতৃস্থানীয় বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। কিন্তু তিনিই যে এই অদ্বৈতবাদের আবিষ্কর্ত্তা তাহা নহে। উপবর্ষ, গৌড়-পাদাচার্য্য ও যোগবাশিষ্ঠকার প্রভৃতি দার্শনিকগণ তাঁহার বহু বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহাদেরই অনুসরণকারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষেপে আজ শঙ্করাচার্য্যের মতগুলি আলোচনা করিব। পরে আমাদের মতে যে সকল জটিল সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া তিনি ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ উৎকট অদ্বৈতবাদী হইয়া পড়িয়াছেন; তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। পরিশেষে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদ কি ভাবে সে সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং কতদূর বা সফলকাম হইয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব।

শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বাক্যমনের অতীত নিত্য-শুদ্ধ-মুক্তস্বভাব পরব্রহ্মই জীবরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। এক জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য যেরূপ এক থাকিয়াও জলাধার ভেদে আপনাকে বিভিন্ন ও বহুসংখ্যক রূপে ব্যক্ত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই একমাত্র পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মও জীবদেহকে আশ্রয় করতঃ আপনাকে বিভিন্ন জীবরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক আত্মবস্তুর স্বরূপ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিতে

গেলে এই সিদ্ধান্তটী অকাট্য সত্য বলিয়াই মনে হয়। আত্মবস্তু এক ভিন্ন বহু হইতেই পারে না। শুধু জীবদেহের পার্থক্য বশতঃ ইহার বিভিন্ন ভাবে উপলব্ধি হয়। হেগেল, ফিক্‌টে, গ্রীন্, কেয়ার্ড্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও এই মতই পোষণ করিয়াছেন। তবে শঙ্করাচার্য্য ও ইঁহাদের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। শঙ্করের মতে,—অজম্ অব্যয়ম্ আত্মতত্ত্বম্ মায়য়ৈব ভিদ্যতে, ন পরমার্থতঃ ; তস্মান্ন পরমার্থ সৎ দ্বৈতম্। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই। তবে যে একটা পার্থক্য অনুভূত হয়, সে শুধু মায়ারই ছলনা মাত্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদ ইহা স্বীকার করিতে রাজী নহে। পরে ইহা বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যে পার্থক্য অনুভূত হয় তাহা আমাদের অজ্ঞানতা-প্রসূত। সত্যে ইহার কোন ভিত্তি নাই। জীবাত্মা যে ব্রহ্মের সমজাতীয় পদার্থ তাহা নহে। জীবাত্মা বলিয়া একটা বস্তুই নাই। কারণ জীবদেহের অস্তিত্বজ্ঞান ভ্রান্তি-সম্ভূত। অতএব ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে শুধু নামেরই প্রভেদ। এই নামভেদও আবার নিরুপাধি নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে দেহাদিধর্ম্মের আরোপেই সংঘটিত। বস্তুতঃ জীবাত্মাও শুদ্ধ বুদ্ধ ও নির্ব্বিকার। ঘটাকাশ বা পটাকাশ যেমন একই আকাশের রূপান্তর মাত্র, সেইরূপ এক ব্রহ্মই বিভিন্ন জীবাত্মারূপে পরিচিত। মহর্ষি বাদরায়ণ কৃত ব্রহ্মসূত্র বা উত্তর-মীমাংসার শারীরক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন,—"ব্রহ্মের ভোক্তা ও ভোগ্য দুই রূপ স্বীকার করা হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু ব্যবহারিক ভাবেই সত্য। মূলে ইহার কোন ভিত্তি নাই। কারণ ও কার্য্যে বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই। ব্রহ্ম এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের কারণ। সুতরাং তিনি কার্য্যরূপে বিশ্ব হইতে মূলতঃ কিছুতেই

ভিন্ন নহেন। এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিতেও স্বীকৃত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন, 'একের বিজ্ঞানেই সর্ব্ববস্তুর বিজ্ঞান পরিসমাপ্ত হয়।' একমাত্র মৃত্তিকার জ্ঞান থাকিলে সর্ব্বপ্রকার মৃন্ময়পাত্রের জ্ঞানলাভ হয়, কারণ ঘট-পটাদি নামমাত্র পৃথক্ হইলেও বস্তুতঃ ইহারা মৃত্তিকাই। অতএব মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য বস্তু। ঘটপটাদি নাম মাত্রই বিভিন্ন বস্তু; শুধু মৃত্তিকাই সকলের মধ্যে উপাদানরূপে সত্যবস্তু। ঘটপটাদির বস্তুতঃ কোন অস্তিত্বই নাই। তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মই সদ্বস্তু। নাম মাত্র বিভিন্ন বিশ্বপ্রপঞ্চের বাস্তবিক কোন সত্তা নাই। জগতের এই ব্রহ্মাত্মক সত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি সাধনগম্য। জ্ঞানোদয়ে ইহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। তজ্জন্যই শ্রুতিতে এ সম্বন্ধে উপদেশ রহিয়াছে। এই অদ্বৈত জ্ঞান যদি মিথ্যাই হইবে, তবে শ্রুতিতে এই জ্ঞানলাভের জন্য উপদেশ থাকিত না। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে শ্বেতকেতু পিতার নিকট এই সত্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যদি বলিতে চাও যে, বৃক্ষ যেমন এক হইয়াও শাখাপ্রশাখাদিভেদে বহু, সমুদ্র যেমন এক হইয়াও তরঙ্গমালারূপে বহু, মৃত্তিকা এক হইয়াও ঘটশরাবাদিরূপে বহু,—তদ্রূপ ব্রহ্মও আত্মস্বরূপে এক অদ্বিতীয় হইয়াও জগৎ ও জীবরূপে বহু। এই অর্থেই ব্রহ্মের সহিত মৃত্তিকা, সমুদ্র প্রভৃতির সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির সারবত্তা কিছুতেই স্বীকার করা চলে না। কারণ শ্রুতিতে একমাত্র মৃত্তিকারই সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে। ইহার বিকারভূত ঘটশরাবাদি অসত্য বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মকে একমাত্র সত্যবস্তু বলা হইয়াছে, আর সমস্তই ব্রহ্মাত্মক সুতরাং অসত্য। 'শ্বেতকেতু, তুমিই ব্রহ্ম (তত্ত্বমসি)' এই বাক্যে শরীরধারী জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জীব যখন জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্ম হইতে আপনাকে অভিন্ন বলিয়া

বুঝিতে পারে, তখন আর তাহার আপনাকে দেহধারী বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সংস্কার অজ্ঞানতাপ্রসূত। কাজেই জ্ঞানলাভ হইলে আর অজ্ঞানতার প্রভাব থাকিতে পারে না। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া চিনিতে পারিলে যেমন সর্পভ্রম বিদূরিত হয়, তদ্রূপ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে আর দেহাত্মবুদ্ধি সম্ভব হয় না। সুতরাং ব্রহ্মের বহুত্ববুদ্ধিও বিদূরিত হয়; কারণ, ব্রহ্ম জীবরূপেই বহু বলিয়া কল্পিত। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, যখন সমস্তই আত্মরূপে অবস্থিত তখন কে কাহাকে কি দিয়া দর্শন করিবে? শ্রুতি আবার ইহাও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি নানা বস্তু দর্শন করে সে অজ্ঞানতা বশতঃ মৃত্যুর বশীভূত হইয়া মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের একত্ব ও বহুত্ব উভয়ই সত্য একথাও বলা যায় না। কারণ, একত্বের জ্ঞান জন্মিলে বহুত্বের জ্ঞান বিনষ্ট হয়, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত।

নিরবচ্ছিন্ন একত্ব বা অদ্বৈত ভাব যখন বহুত্বের বিরোধী তখন বহুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাধারণ যুক্তি প্রদর্শন করা সমীচীন নহে। কারণ, প্রমাণ-প্রদর্শনকালে যে সকল বস্তুর উল্লেখ করা হয়, সে সমস্তই স্থাণুতে মনুষ্যজ্ঞানের ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদি বল ব্রহ্মকে বহু স্থানে শ্রুতিতে বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যদি ব্রহ্মের একমাত্র কূটস্থ সত্তাই সত্য হয়, তাহা হইলে এ সকল শ্রুতিবাক্য মিথ্যা হইয়া যায়, কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রুতিতে সগুণ ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলা হইয়াছে। এই জগৎকারণ সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, এবং মুক্ত; অচেতন প্রধান বা অন্য কিছু নহে ইহা বলাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর মায়াশক্তির অনুবলে জগৎ সৃষ্টি করেন। নামরূপ দ্বারা বিভিন্ন দেহধারী জীবসমূহ এই সগুণ ঈশ্বরেরই অংশীভূত। এই জন্য সগুণ ঈশ্বরকে ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং

সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি উপাধিদ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ও জীবসমূহ এই উভয়ের একটীও সত্য নহে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে তুরীয় ব্রহ্মসত্তায় উপনীত হওয়া যায় তাহা সর্ব্বপ্রকার উপাধি-বর্জ্জিত। তিনি নিয়ন্তাও নহেন, সর্ব্বজ্ঞও নহেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে, জীব যদি ব্রহ্মই হইল তবে তাহার অপূর্ণতার জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? মানুষ ত সর্ব্বদা আপনাকে ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ বলিয়াই অনুভব করে। আপনাকে কই শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ বলিয়া ত মনে করে না? শঙ্করাচার্য্য ইহার উত্তরে বলিবেন—মানুষ মায়ার প্রভাবে আত্মস্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে; তাই এই ভ্রান্তিজালে পড়িয়া সংসারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সে নিজে শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত হইয়াও আত্মাতে দেহাদি ধর্ম্মের আরোপ করে। এই দেহাত্মবুদ্ধিই অশেষ দুঃখের আকর। বাস্তবিক দেহাদির অস্তিত্ববোধ মায়াপ্রসূত। মানুষ যখন আত্মতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা আপনাকে মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারে, তখন তাহার এই দেহবদ্ধাবস্থার ভ্রান্তি দূরীভূত হয়। তখন সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে যে সে আদিহীন, অন্তহীন, হ্রাসহীন, বৃদ্ধিহীন, নিত্য ও পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে। তখন সে বুঝিতে পারে,—

> ন বিরোধো নচোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ।
> ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জীব যদি ব্রহ্মই হইল, তবে তাহার এত দুঃখ তাপ, এত জ্বালা যন্ত্রণা কেন? ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিবেন—ইহাও তাহার দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই প্রসূত। বাস্তবিক এই শোকদুঃখ, পাপতাপ, ভয়ক্রোধ এসব দেহেরই ধর্ম্ম। একটী রক্তবর্ণ পুষ্পের নিকটে একখণ্ড স্ফটিক স্থাপন করিলে যেমন পুষ্পের বর্ণ ঐ স্ফটিকে প্রতিফলিত হয় এবং

এরূপে ইহা রক্তবর্ণ বলিয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ আত্ম-বস্তুতে দেহাদি ধর্ম্মের আরোপ হওয়ায় আত্মবস্তু পূর্ব্বোক্ত শোকদুঃখ প্রভৃতি গুণ-ধর্ম্ম-সমন্বিত বলিয়া অনুমিত হয়। শুধু জীব কেন এই মায়ার হস্ত হইতে ভগবান্ নিজেও মুক্ত নহেন। তিনিও যখন মায়াদ্বারা আক্রান্ত হন, স্বয়ং নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার হইয়াও ভোক্তা পাতা ও বিধাতা হইয়া দাঁড়ান, তখন এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা জীবের পক্ষে যে কতটা দুঃসাধ্য ইহাতেই বুঝা যাইবে। মানুষ সদ্‌গুরুর উপদেশে সাধনমার্গ অবলম্বন করতঃ ক্রমে ক্রমে এই মায়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

মায়ার প্রভাবে আমরা যে শুধু আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করি তাহা নহে, বহির্জ্জগতের অস্তিত্বের অনুভূতিও মায়াপ্রসূত। যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিয়া অনেক সময় সর্প বলিয়া ভ্রম জন্মে, তেমনই একমাত্র পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মকে আমরা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ বলিয়া মনে করি। একমাত্র ব্রহ্মই সৎ আর যাহা কিছু আছে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা আমাদের কল্পনাপ্রসূত সুতরাং অসৎ। এই অবস্তুকে বস্তু বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইতে সক্ষম বলিয়াই অদ্বৈতবাদিগণ মায়াকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলিয়াছেন। যেমন ইন্দ্রজালের প্রভাবে নানা অসম্ভব বস্তু দৃষ্টি-গোচর হয় তেমনই এই মহাপ্রভাবময়ী অবিদ্যার প্রভাবে আমাদের নানা-রূপ ভ্রান্ত সংস্কার জন্মে। এই মায়া বা অবিদ্যার স্বরূপ সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদি-গণ বলিবেন, ইহা জলে শৈত্যের ন্যায় ব্রহ্ম প্রকৃতিতে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। মায়া সম্বন্ধে, ইহার বেশী আর কিছুই বলা যায় না। কারণ ইহা—

সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী।

এই মায়া যে শুধু আমাদের মনে জীবাত্মা ও জগতের অস্তিত্বের সংস্কার জন্মাইয়া ক্ষান্ত থাকে তাহা নহে। এই মায়ার প্রভাবে আমরা নির্গুণ নিরুপাধি পরব্রহ্মে গুণ ও উপাধিধর্ম্মের আরোপ করিয়া মহাভ্রান্তিজালে আবদ্ধ হই। যিনি অকর্ত্তা তাঁহাতে জগৎ-কর্ত্তৃত্বের আরোপ করি। যিনি ঐশ্বর্য্যবিহীন, তাঁহাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করি। যিনি সাধুও নহেন অসাধুও নহেন, তাঁহাকে সাধু আখ্যা প্রদান করি। যিনি জ্ঞানীও নহেন আবার অজ্ঞানও নহেন, তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করি। ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার সময় অদ্বৈতবাদিগণ শুধু তাঁহাকে নঞ্ সংজ্ঞাদ্বারা ব্যক্ত করেন। তিনি যখন সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের অতীত, তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে, শুধু ইহা নয়—ইহা নয় বলিতে হয়। তাঁহাকে প্রকাশ করিবার অন্য কোন উপায় নাই, তাই তিনি—

অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্।—

(—বৃহদারণ্যক)

এক কথায় বলিতে গেলে, জগতে আমরা যে সকল গুণ বা বস্তু প্রত্যক্ষ করি, ব্রহ্মবস্তু সে সব হইতে পৃথক্ ইহা দেখাইয়া তাহার সত্তা বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাই তিনি—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।

তিনি বাক্য ও মনের অতীত। তিনি অচিন্ত্য। তাঁহার হস্ত নাই, পদ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই। এই বিশ্বের তিনি কর্ত্তা নহেন। কারণ তিনি কর্ত্তৃত্বগুণবিরহিত। শঙ্করের মতে তাঁহার নির্গুণ ভাবই সত্য, তাঁহার সগুণ ভাব আমাদের কাল্পনিক সৃষ্টিমাত্র।

ব্রহ্মের এই নির্গুণভাব সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশবিহীন হওয়াতে, তাঁহাকে কোন চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না। সুতরাং তিনি চিন্তার অতীত, বাক্যের

অতীত, মনের অতীত। কিন্তু তাঁহার সগুণ ভাব সৃষ্টির মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। এই জন্য শ্রুতিতে তাঁহার যেমন নির্গুণ সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে, তাঁহার সগুণ সত্তাকেও সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। তাই একদিকে তিনি যেমন 'অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বমদীর্ঘম্', অন্যদিকে তিনি —'সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ'। কিন্তু শঙ্করের মতে শ্রুতিতে উভয় স্বরূপের কথা থাকিলেও ব্রহ্মের নির্গুণ সত্তাই সত্য এবং পারমার্থিক। তাঁহার সগুণ সত্তা মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র।

এক্ষণে বুঝা গেল ব্রহ্মবস্তু নির্গুণ বলিয়া তাঁহাকে জগৎস্রষ্টা বলা যায় না। তবে কি এই জগৎটা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অলীক? শঙ্করাচার্য্য একথাও স্পষ্ট করিয়া বলিতে রাজী নহেন। তাঁহার মতে স্বপ্নের সৃষ্টি সম্পূর্ণ অসত্য। কিন্তু এই ভূতপ্রপঞ্চ স্বপ্নসৃষ্টি অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সত্য হইলেও, ইহাও পারমার্থিক সত্য নহে। যাহা হউক অদ্বৈতবাদিগণ জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন, কিন্তু তাই বলিয়া জগৎ বাস্তবিক সত্য নহে। যাহা ত্রিকালস্থায়ী তাহাই পারমার্থিক সত্য।

মরুভূমিতে চলিতে চলিতে এক জায়গায় মৃগতৃষ্ণিকা দেখা গেল। পথিক মরূদ্যানস্থিত সরোবর ভাবিয়া সেদিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। কিন্তু পরিশেষে দেখিতে পাইল যে, ইহা বাস্তবিক সরোবর নহে। ইহা তাহার ভ্রান্তি মাত্র। তখন সে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। আর একদিন হয়ত বাস্তবিক মরূদ্যানস্থিত কোন সরোবর তাহার নয়নপথে পতিত হইল। কিছুক্ষণ পরে সেই সরোবরে গিয়া জলপান করতঃ তৃষ্ণায় শান্তিলাভ করিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বদৃষ্ট মরীচিকা সরোবররূপে প্রতীয়মান হইলেও তাহা বাস্তবিক সরোবর নহে। কারণ তাহা প্রমাণে টিকিল না। সুতরাং ইহা মিথ্যা। জগৎও ঠিক সেরূপ বাস্তবিক

সত্যবস্তুরূপে প্রতীয়মান হইলেও ইহা পরমার্থজ্ঞানের নিকট স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। সুতরাং ইহা অসত্য। মরুস্থানস্থিত সরোবর কিন্তু জ্ঞানে বাধাপ্রাপ্ত হইল না। সুতরাং ইহা সত্য। ঠিক সেরূপ ব্রহ্মবস্তুই পরাজ্ঞান দ্বারা একমাত্র সত্য বস্তুরূপে প্রমাণিত হয়। আর সবই মিথ্যা।

বাস্তবিক একমাত্র মৃত্তিকার বিকৃতি হইতে যেমন ঘট পট ও কুম্ভাদির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই জগতের যাবদীয় বস্তুরূপে প্রকাশ পাইতেছে। জগতের বস্তুসমূহ নানা নামে পরিচিত। কাহাকেও বৃক্ষ, কাহাকেও লতা, কাহাকেও পুষ্প, কাহাকেও পশু, কাহাকেও পক্ষী, কাহাকেও বা মানুষ নামে অভিহিত করা হয়। বাস্তবিক এসকল একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু ঘট পট কুম্ভাদির মৃত্তিকা হইতে কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র সত্তা আছে। কারণ ইহারা মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহাদের শুধু মৃত্তিকা বলা চলে না। কারণ কুম্ভকারের শক্তিপ্রয়োগে এস্থলে মৃত্তিকার বিকৃতি ঘটিয়াছে। জগতের কিন্তু ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র এরূপ কোন সত্তা নাই। ইহা একমাত্র মায়ারই সৃষ্টি। এই মায়া বা ভ্রান্তির অবসান হইলে, আমরা একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই পাইব না। কিরূপে আমরা এই ভ্রান্তি হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারিব, শঙ্করাচার্য্য তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অহংগ্রহ উপাসনাই মুক্তির একমাত্র নিদান। 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ধ্যানে নিমগ্ন হওয়াই অহংগ্রহ উপাসনা নামে অভিহিত হইয়াছে। একমাত্র এই উপাসনার প্রভাবেই মানুষ বিদেহ-মুক্তি লাভ করিতে পারে অর্থাৎ একমাত্র ইহা দ্বারাই মানুষ আপনার স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপে বিলীন হইতে পারে।

এরূপে শারীরক ভাষ্যের বহুস্থলে শঙ্করাচার্য্য একশেষ অদ্বৈতবাদের

প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্র তিনি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে তাঁহার ব্যাখ্যা দেখিলে মনে হয় যেন তিনি দ্বৈতাদ্বৈত মীমাংসাই প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কিন্তু মোটের উপর তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের বিরোধী। বিশুদ্ধাদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।

যাহা হউক এতক্ষণ ধরিয়া আমরা শঙ্করাচার্য্যের সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামোটি একটা জ্ঞানলাভ করিলাম। মোট কথা, কি কি পাইলাম,—একবার দেখা যাউক। পরিশেষে এই সকল মত কতদূর সমীচীন তাহার আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদ এসকল সমস্যার কি মীমাংসা করিয়াছে, তাহাও একবার দেখিতে চেষ্টা করিব।

শঙ্করের মতে একমাত্র পূর্ণ নির্ব্বিকার নির্গুণ নিরবয়ব পূর্ণব্রহ্মই সত্য। জগতের বাস্তবিক কোন সত্তা নাই। আমরা যে এক বিরাট্ ভূতপ্রপঞ্চের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তাহা সম্পূর্ণ মায়াপ্রসূত; আমরা অবিদ্যা বা অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়াই এইরূপ ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ হই। আমরা যে মানবদেহ বা মানবাত্মার পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিয়া লই, তাহাও সম্পূর্ণ মায়াপ্রসূত। ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্ব্বিকার। তিনি স্রষ্টা বা বিধাতা নহেন। আমরা যে তাঁহাতে গুণধর্ম্মের আরোপ করি, তাহা আমাদের অজ্ঞানতার পরিচায়ক। আমরা যতই সাধনার বলে পরমার্থ-জ্ঞানলাভ করিব, ততই এই ভ্রান্তিজাল হইতে উদ্ধারলাভে সমর্থ হইব।

শঙ্করাচার্য্য আপনার শারীরক ভাষ্যের বহুস্থলে এরূপ উৎকট অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বরচিত পুস্তকগুলি পাঠ করিলে তাঁহাকে এরূপ একশেঁষ অদ্বৈতবাদী বলিয়া মনে হয় না। তবে সর্ব্বত্রই তাঁহার 'সোঽহংবাদে'র পরিচয় পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস

এ সকল মূল গ্রন্থ তাঁহার পরিণত বয়সে রচিত হইয়াছিল। কারণ ইহাতে জ্ঞানের আরও পরিপক্কতার পরিচয় রহিয়াছে। শঙ্কর তাঁহার বাক্যবৃত্তি নামক গ্রন্থে গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বলিতেছেন :—

অন্তঃকরণতদ্‌বৃত্তিসাক্ষী চৈতন্যবিগ্রহঃ।
আনন্দরূপঃ সত্যঃ সন্‌ কিং নাত্মানং প্রপদ্যসে॥
সত্যানন্দস্বরূপং ধীসাক্ষিণং বোধবিগ্রহম্‌।
চিন্তয়াত্মতয়া নিত্যং ত্যক্ত্বা দেহাদিগাং ধিয়ম্‌॥
রূপাদিমান্‌ যতঃ পিণ্ডস্ততো নাত্মা ঘটাদিবৎ।
বিষয়াদিমহাভূতবিকারত্বাচ্চ কুম্ভবৎ॥
অনাত্মা যদি পিণ্ডোঽয়মুক্তহেতুবলান্মতঃ।
করামলকবৎ সাক্ষাদাত্মানং প্রতিপাদয়॥
ঘটদ্রষ্টা ঘটাদ্ভিন্নঃ সর্ব্বথা ন ঘটো যথা
দেহদ্রষ্টা তথা দেহো নাহমিত্যবধারয়॥

অর্থ—হে শিষ্য, তুমি স্বয়ং অন্তঃকরণ এবং তাহার সাক্ষীস্বরূপ অবস্থিত। তুমিই চৈতন্যবিগ্রহ, আনন্দস্বরূপ এবং সত্য পদার্থ। তথাপি তুমি কেন নিজকে আত্মরূপে জানিতেছ না? তুমি সত্য ও আনন্দস্বরূপ এবং বুদ্ধিশক্তির সাক্ষীরূপে অবস্থিত জ্ঞানপদার্থকে দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মরূপে চিন্তা কর। তোমার দেহপিণ্ড ঘটাদির ন্যায় রূপাদিসংযুক্ত; সুতরাং ইহা আত্মা নহে। পঞ্চমহাভূতের বিকারে ইহার অভ্যুদয়; অতএব ইহা কিছুতেই আত্মা নহে। এ সকল কারণে শরীর যখন আত্মবস্তু নহে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল, তখন করতলন্যস্ত অমলকের ন্যায় আত্মাকে সাক্ষাৎ ভাবে লাভ করিতে চেষ্টা কর। ঘটদ্রষ্টা পুরুষ যেমন ঘট হইতে পৃথক্‌ ভাবে অবস্থিত, এবং কিছুতেই

তাহাকে ঘট বলা যাইতে পারে না, সেরূপ দেহের দ্রষ্টা আমি দেহ নহি।

এরূপে দেহাত্মবুদ্ধির নিরাসন পূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন। আত্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যার এই অংশটুকু এত সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে বার বার পাঠ না করিয়া থাকা যায় না। শঙ্কর বলিতেছেন,—

এবমিন্দ্রিয়দৃঙ্‌নাহমিন্দ্রিয়াণীতিনিশ্চিনু।
মনোবুদ্ধিস্তথা প্রাণো নাহমিত্যবধারয়॥
সঙ্ঘাতোঽপি তথা নাহমিতি দৃশ্যবিলক্ষণম্।
দ্রষ্টারমনুমানেন নিপুণং সম্প্রধারয়॥
দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা হানাদিব্যাপৃতিক্ষমাঃ।
যস্য সন্নিধিমাত্রেণ সোঽহমিত্যবধারয়॥
অনাপন্নবিকারঃ সন্নয়স্কান্তবদেব যঃ।
বুদ্ধ্যাদীংশ্চালয়েৎ প্রত্যক্ সোঽহমিত্যবধারয়॥
অজড়াত্মবদাভান্তি যৎসান্নিধ্যাজ্জড়া অপি।
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাঃ সোঽহমিত্যবধারয়॥
অগমন্মে মনোঽন্যত্র সাম্প্রতং চ স্থিরীকৃতম্।
এবং যো বেত্তি ধীবৃত্তিং সোঽহমিত্যবধারয়॥
স্বপ্নজাগরিতে সুপ্তিং ভাবাভাবৌ ধিয়ং তথা।
যো বেত্ত্যবিক্রিয়ঃ সাক্ষাৎ সোঽহমিত্যবধারয়॥
ঘটাবভাসকো দীপো ঘটাদন্যো যথেষ্যতে।
দেহাবভাসকো দেহী তথাহং বোধবিগ্রহঃ॥
পুত্রবিত্তাদয়ো ভাবা যস্য শেষতয়া প্রিয়াঃ।
দ্রষ্টা সর্ব্বপ্রিয়তমঃ সোঽহমিত্যবধারয়॥

পরপ্রেমাস্পদতয়া মানভূতমহং সদা।
ভূয়াসমিতি যো দ্রষ্টা সোঽহমিত্যবধারয় ॥

অর্থ—আমি ইন্দ্রিয়ও নহি, ইন্দ্রিয়সমূহের দ্রষ্টা। এরূপে আমি মন বুদ্ধি কি প্রাণও নহি, আমি ইহাদেরও দ্রষ্টা। দেহেন্দ্রিয়াদির সমষ্টিকেও আত্মা বলা চলে না। আমি দৃশ্য বস্তু সমূহ হইতে বিভিন্ন। কারণ আমি নিখিল পদার্থের দ্রষ্টা। যাঁহার সান্নিধ্য বশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব ব্যাপার সংসাধন করে আমিই সেই আত্মা। যিনি অয়স্কান্তমণির ন্যায় নিজে অবিকৃত থাকিয়া প্রত্যেকের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতিকে পরিচালিত করেন, আমি সেই আত্মা। যাঁহার আবির্ভাবে দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ জড় হইয়াও অজড়-স্বভাবের ন্যায় প্রতিভাত হয়, সেই আত্মাই আমি। আমার মন অন্যত্র গমন করিয়াছিল, এরূপ জ্ঞানে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীস্বরূপ আত্মাই আমি। সেই আত্মাই আমি যিনি স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি এবং বুদ্ধির অস্তিত্ব ও অভাব সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করেন। ঘটের প্রকাশক প্রদীপ যেরূপ ঘট নহে, পরন্তু ঘট হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত, সেরূপ দেহের অবভাসক দেহী বা আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র। যিনি অপত্য ও বিত্তাদিকে প্রিয় বলিয়া মনে করেন না, যিনি সর্ব্বদর্শী এবং সমস্তই যাঁহার প্রিয়তম, সেই আত্মাই আমি।

শঙ্করাচার্য্য আবার এই গ্রন্থেরই ২৯শ হইতে ৩৪শ শ্লোকে বলিতেছেন, যিনি সর্ব্ববিধ সংসার-দোষ-বিবর্জ্জিত, যিনি স্থূলাদিলক্ষণ-পরিশূন্য, যিনি দর্শনাদি ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়-বহির্ভূত, এবং যিনি পাপপরিশূন্য, তিনিই আত্মা। যাঁহার আনন্দের হ্রাসবৃদ্ধি নাই, যিনি সত্যপ্রজ্ঞানবিগ্রহ, যাঁহার সত্তা সর্ব্বত্র অনুভূত হয়, এবং যিনি নিত্য পরিপূর্ণ, তিনিই পরমাত্মারূপে কীর্ত্তিত। বেদ যাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছেন তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। যাঁহাকে জানিলে সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয় বলিয়া শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতি যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যাঁহার কার্য্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম। বেদান্তগ্রন্থে মুক্তিকামী জ্ঞানিগণ যাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক পরিজ্ঞাত হইতে হইবে বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যিনি জীবাত্মারূপে সর্ব্ব দেহে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, যিনি সকলের নিয়ন্তা বলিয়া বেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিও। যিনি সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা এবং জীবসমূহের হেতু ও স্রষ্টা, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া জানিও।

এই শেষোক্ত কয়েকটী শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য আপনার একশেষ অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করতঃ জীব ও বিশ্বের অস্তিত্ব কতকটা স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষিগণের সহিত একমত হইয়া ব্রহ্মকে স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও অনন্তরূপী পরমেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন কি তাঁহাকে জ্ঞানময়, আনন্দময়, জীবাত্মরূপী এবং সর্ব্ব কর্ম্মের ফলদাতারূপেও স্বীকার করিয়াছেন।

আবার আপনার তত্ত্বোপদেশ নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন,—

সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণমুচ্যতে।
সত্যত্বাৎ জ্ঞানরূপত্বাদনন্তত্বাত্ত্বমেব হি॥
সতি দেহাদ্যুপাধৌ স্যাজ্জীবস্তস্য নিয়ামকঃ ।
ঈশ্বরঃ শক্ত্যুপাধিত্বাদ্দ্বয়োর্ব্বাধে স্বয়ং-প্রভঃ॥

অর্থ—যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, ও অনন্তস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম। তুমিও সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপী অতএব তুমিও ব্রহ্ম। (এস্থলেও ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান ও অনন্তত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর স্বীকার করা হইল।) জীব

দেহাদি উপাধিবিশিষ্ট এবং ঈশ্বর মায়োপাধিবিশিষ্ট। যিনি এই উভয়ের প্রকাশক, যিনি নিরুপাধি এবং স্বয়ংপ্রভ,—তিনিই ব্রহ্ম। এস্থলে ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব এই তিনের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাও একশেষ অদ্বৈতবাদের বিরোধী।

এই বাক্যবৃত্তি ও তত্ত্বোপদেশ ব্যতীত শঙ্করাচার্য্য স্বরচিত অজ্ঞান-বোধিনী, হস্তামলক প্রভৃতি গ্রন্থেও স্থানে স্থানে এরূপ মত প্রচার করিয়া-ছেন। শারীরক ভাষ্যে যে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ দেখা যায় এ সকল মত তাহার বিরোধী। এই ভেদাভেদবাদের পরিচয় পাইয়া অনেক দার্শনিক পণ্ডিত এ সকল গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের রচিত নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এসকল গ্রন্থ অপর লোকের রচিত। নিজেদের নামে গ্রন্থ প্রচার না করিয়া তাঁহারা বিশ্রুতকীর্ত্তি শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠার সাহায্যে আপনাদের মতগুলি চালাইয়াছেন। অবশ্য শঙ্করাচার্য্যের নামে যে অনেকগুলি অসার গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ সকল গ্রন্থকে কিছুতেই শঙ্করের রচিত বলা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্যবৃত্তি, তত্ত্বোপদেশ, অজ্ঞানবোধিনী প্রভৃতি গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ এসকল গ্রন্থে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় রহিয়াছে। বহুস্থলে শারীরক ভাষ্যের অনুযায়ী মতও দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তত্ত্বোপদেশ নামক গ্রন্থের ৪৭ হইতে ৫৪ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম ও আত্মাকে অভিন্ন রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া জগৎকে অসৎ বলিয়া স্থির করিবে। তখন তুমি অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করিতে পারিবে। যাঁহার দর্শনলাভ হইলে অদ্বৈত চিদ্‌ঘন ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া যায়, বেদান্ত শাস্ত্র তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। দ্বৈত জড়-জগৎ ইহার প্রতিপাদ্য নহে। অসৎ

জড়-জগৎ দুঃখময়। আর অদ্বৈত চিন্ময় পরব্রহ্ম সুখস্বরূপ। বেদান্ত শাস্ত্র ইহা সম্যক্ নির্ণয় করিয়াছে। অদ্বৈত ব্রহ্মই সৎ, আর দ্বৈত জড়-জগৎ অসৎ, এই জ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টা করিবে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই মায়াময় জড় জগতের অস্তিত্ব জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যাইবে। শুক্তিদর্শনে যেরূপ রৌপ্যভ্রম হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তুতেও জগদ্‌ভ্রম হইয়া থাকে। পরমাত্মা নিত্য সত্তাশীল, কিন্তু জড়-জগৎ অসত্য।

এরূপ আরও বহু স্থলে এই অদ্বৈতবাদের পরিচয় রহিয়াছে। সুতরাং এ সকল গ্রন্থ যে শঙ্করের স্বরচিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থগুলিতেও এরূপ অদ্বৈতবাদের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাহা হউক আধুনিক পণ্ডিতগণ শঙ্করাচার্য্যকে উৎকট অদ্বৈতবাদী বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন। তাঁহাদের বিশ্বাস পঞ্চদশী ও যোগবাশিষ্ঠের একশেষ অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্য্যের উপর আরোপ করতঃ ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রতি ঘোর অবিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শঙ্করাচার্য্য বাস্তবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদীই ছিলেন, তবে অদ্বৈত-বাদের দিকে অতিরিক্ত পরিমাণে অগ্রসর ছিলেন এই মাত্র। বাস্তবিক শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্যের কয়েক স্থলে তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদেরই পরিচয় দিয়াছেন। সে যাহা হউক শঙ্করাচার্য্য একশেষ অদ্বৈতবাদী বলিয়াই সাধারণতঃ পরিচিত। শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসিগণ ঘোর অদ্বৈতবাদী। শঙ্কর দর্শনকেও তাঁহারা সেই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শঙ্করা-চার্য্যের রচিত গ্রন্থসমূহে, বিশেষতঃ তাঁহার শারীরক ভাষ্যে যে উৎকট অদ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, আমরা পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে আমরা এই একশেষ অদ্বৈতবাদ বিবৃত

করিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাক্, এই একশেষ অদ্বৈতবাদ কতদূর যুক্তি-সঙ্গত।

ব্রহ্মসত্তায় পঁহুছিবার আমাদের তুটী বই আর রাস্তা নাই। এক আত্মতত্ত্ব আর এক বিশ্বতত্ত্ব। আত্মার স্বরূপ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে, আমরা ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত হইতে পারি। মানবাত্মায় যে সকল গুণ বা ধর্ম্ম অস্ফুট বা অর্দ্ধস্ফুট অবস্থায় দেখিতে পাই, তাহার পূর্ণতাই ব্রহ্ম। অবশ্য মানবাত্মার সহিত ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এটুকু বলা যায় যে, পূর্ণব্রহ্ম আপনাকে অপূর্ণ মানবাত্মারূপে প্রকাশ করেন বলিয়াই, আমরা মানবাত্মার আলোচনা দ্বারা পরমাত্মায় গিয়া পঁহুছিতে পারি। আবার মানবাত্মার স্বরূপ বুঝিতে হইলে ইহার অভিব্যক্তির প্রকৃতি আলোচনা করিতে হয়। আত্মার কার্য্যের মধ্য দিয়াই ইহার প্রকৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতেই আত্মাকে চেনা সম্ভব হয়। আত্মার কার্য্যগুলি কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা যায়। মোটামোটি সে কয়টী এই :—(১) বহির্জ্ঞান, স্মৃতি, কল্পনা ও বিচার। (২) সুখ দুঃখের অনুভূতি এবং প্রীতি বা ভাবাবেগ। (৩) মনন ও সাধন। এসব লইয়াই আত্মার অস্তিত্ব। একটুকু সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বাহ্যজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া সাধন (volition) পর্য্যন্ত আত্মার এই যে একটা কর্ম্মচক্র ইহা সম্পূর্ণরূপে এক বিশ্ব বা ভূত-প্রপঞ্চের অস্তিত্বসাপেক্ষ। অর্থাৎ আত্মার বাহ্যজ্ঞান আরম্ভ হয় বহির্জ্জগৎ হইতে ; আবার আত্মার সৃজন বা সাধন শক্তির পর্য্যবসান হয় বহির্জ্জগতে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটী আরও একটু পরিস্ফুট করা যাউক। মনে করুন, বাগানে বেড়াইতে গিয়া একদিন একটী ফুল দেখিতে পাইলাম। ফুলটী দেখিয়া মনে মনে প্রশ্ন হইতে লাগিল, এটী কোন্ জাতীয় ফুল।

তখন হয়ত মনে পড়িয়া গেল, এরূপ ফুল আমি আরও দেখিয়াছি। বুঝিলাম, এটী একটি গোলাপফুল। মনে মনে ভাবিলাম, ফুলটী তুলিয়া নিয়া টেবিলের অন্যান্য ফুলের সঙ্গে সাজাইয়া রাখিলে বেশ সুন্দর দেখাইবে। এরূপে ফুলটীর উপর আমার বড় আসক্তি জন্মিল। তার পর ফুলটী তুলিয়া আনিলাম। ইহাতে আত্মার কি কি বৃত্তি প্রকাশ পাইল, তাহা একবার দেখা যাউক। ফুলটী প্রথম দেখার নাম হইল বহির্দ্দর্শন (perception); তার পর আসিল চিন্তা (elaboration); অনন্তর এরূপ অন্য একটী ফুলের কথা মনে পড়ার নাম হইল স্মৃতি (recollection)। তার পর হইল, ফুলটীর সঙ্গে পরিচয় (recognition); ইহার পর কল্পনা (imagination) আসিয়া উপস্থিত হইল। টেবিলের উপর সাজাইবার কল্পনা হইতে ফুলটীর প্রতি যে আসক্তি জন্মিল তাহার নাম প্রীতি (emotion); তার পর ফুলটী তুলিয়া আনিবার যে সঙ্কল্প করিলাম, তাহার নাম হইল মনন (determination); অনন্তর ফুলটী যে তুলিয়া আনা হইল, ইহাই হইল সাধন (volition); এ স্থানে বহির্দ্দর্শন, চিন্তা ও কল্পনা পর্য্যন্ত হইল, আত্মার জ্ঞানশক্তির বিকাশ। প্রীতি বা আসক্তিতে হইল, ভাববৃত্তির বিকাশ। তারপর হইল আত্মার কর্ম্মশক্তির প্রকাশ। একটী কাজের মধ্য দিয়া এরূপে আত্মার সমগ্র প্রকৃতি প্রকাশ পাইল। এখন যদি বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিই, বহির্দ্দর্শন ভিত্তিহীন হইয়া যাইবে। আবার সর্ব্বশেষ কর্ম্মশক্তির প্রকাশও বহির্জ্জগতে। সুতরাং ইহাও মিথ্যা। এ দু'টী যখন মিথ্যা হইল, তখন ইহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী বৃত্তিগুলিরও কোন ভিত্তি নাই। সুতরাং আত্মা জিনিসটাই মিথ্যা প্রমাণিত হইল। কার্য্যকে অস্বীকার করিতে হইলে, কারণকেও অস্বীকার করিতে হইবে। কার্য্যগুলিকে মিথ্যা বলিলে, কারণকে আর সত্য বলিবার উপায় নাই।

আবার আত্মা যে দেহটী লইয়া এতগুলি কার্য্য সাধন করে, তাহাও মিথ্যা। অতএব দেখা যাইতেছে, বিশ্বজ্ঞান অসত্য হইলে, আত্মজ্ঞানও অসত্য হইয়া যায়। আবার আত্মজ্ঞান অসম্ভব হইলে তল্লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞানও অসম্ভব। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার প্রথম পথ বন্ধ হইয়া গেল। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের দ্বিতীয় উপায় বিশ্বতত্ত্ব। জগতের ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া আমরা ইহার কারণরূপিণী এক মহাশক্তির পরিচয় পাই। এই মহা-শক্তি এই বিরাট্ বিশ্বের সংখ্যাতীত ঘটনার মধ্য দিয়া আমাদের কাছে এক অপরিমেয় ইচ্ছাশক্তিরূপে ধরা দেয়। আবার এই ঘটনাবলীর মধ্যে এমন নির্ব্বাচন-শক্তির পরিচয় রহিয়াছে যে, তদ্দ্বারা আমরা এই মহাশক্তিকে অপার কৌশলময়ী বলিয়া চিনিয়া লই। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিশ্বই মিথ্যা। কাজেই এ সকল সিদ্ধান্ত ভিত্তিশূন্য হইয়া যায়। অদ্বৈত-বাদিগণ বাস্তবিকই এই সগুণ ব্রহ্মকে মায়িক বা মিথ্যা বলিয়াছেন। আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞান হইতে আমরা যে ব্রহ্মের সত্তায় উপনীত হই, তাহা সগুণ, নির্গুণ নহে। তাঁহারা একমাত্র এক অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু এই নির্গুণ ব্রহ্ম শুধু সত্তা মাত্র। কোন সংজ্ঞা দ্বারা ইহাকে নির্দ্দেশ করার যো নাই। প্রত্যেক বস্তুরই একটা না একটা প্রকৃতি আছে। এই প্রকৃতি ইহার গুণসমষ্টির অপর নাম। সুতরাং যাহার গুণ নাই তাহার অস্তিত্বও নাই। মানবাত্মাও এক জ্ঞান-প্রেম-ইচ্ছাময়ী শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ইহাও সগুণ। বাস্তবিক কি উপায়ে যে অদ্বৈতবাদিগণ নির্গুণ ব্রহ্মের সত্তায় উপনীত হইলেন, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। আমরা যদি এই ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বসি, তাঁহারা কি উপায়ে ইহা সপ্রমাণ করিবেন, ইহা আমাদের ধারণাতীত। তাই সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত দার্শনিক রামানুজাচার্য্য এই

নির্গুণ শব্দের অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম 'নিখিল-হেয়-প্রত্যনীক' অর্থাৎ তাঁহাতে পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ ইত্যাদি হেয় গুণাবলীর, লেশ মাত্রও নাই, তাই তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আবার তিনি অশেষ কল্যাণগুণসমন্বিত, তাই তিনি সগুণ। কিন্তু দার্শনিক পাণ্ডিত্য হিসাবে রামানুজ শঙ্করের সমকক্ষ নহেন। দর্শনশাস্ত্রের উচ্চতম তত্ত্বসম্বন্ধীয় বহু জটিল সমস্যার তিনি কোন উত্তর দেন নাই। বিশেষতঃ, তিনি অনেকটা দ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর।

জগৎ যে মিথ্যা নহে, ইহা অন্য ভাবেও সপ্রমাণ করা যায়। আমাদের নিকট বহির্জ্জগৎ একটা দেশকালনিবদ্ধ বিজ্ঞানসমষ্টিরূপে (aggregate of ideas) প্রকাশ পায়। একটী বস্তু অন্য বস্তু হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত, এবং আমা হইতেও ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে, এই ধারণা হইতেই দেশ বা স্থানের জ্ঞান জন্মে। 'পুস্তকখানি একটা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।' ইহার মোটামোটি অর্থ এই যে, অন্য বস্তু হইতে ইহার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে, এবং আমা হইতেও ইহা পৃথক্। তারপর কতকগুলি ঘটনা আমরা সময়ে নিবদ্ধ করিয়া পূর্ব্বাপর ভাবে অনুভব করি। একটী ঘটনার পূর্ব্বে অথবা পরে আর একটী ঘটনা দেখি। এই অগ্রপশ্চাৎ সম্বন্ধের নামই 'কাল'। মনে করুন, একটী পাখী উড়িয়া গেল, দেখিতে পাইলাম। পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে দেখিলাম এক ব্যাধ বন্দুকহস্তে আসিতেছে। এই ঘটনাদ্বয়ের অগ্র পশ্চাৎ সম্বন্ধ হইতে দুটা ঘটনার কাল বুঝা গেল। এরূপে, ক্রমে আমাদের কালের জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। আচ্ছা, একটী ঘটনা পূর্ব্বে ঘটিল, আর একটী ঘটনা পরে ঘটিল, এই জ্ঞানের মূল কোথায়? আমরা পূর্ব্বোক্ত দুটী ঘটনাকে এক সঙ্গে ঘটিয়াছে মনে করি না কেন? তাহার কারণ যেটী পূর্ব্বে ঘটিল, তাহা বাস্তব সত্তা পরিত্যাগ করতঃ

আমাদের স্মৃতিতে অবস্থিত রহিল। অর্থাৎ তাহা বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়জ্ঞান-সাপেক্ষ নহে। আমার স্মৃতিতে তাহার অস্তিত্ব। পরবর্ত্তী ঘটনা আমার বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়-জ্ঞানসাপেক্ষ সুতরাং পূর্ব্ব ঘটনা হইতে অধিকতর স্পষ্ট। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাটী কতকটা বিস্মৃতির দিকে গিয়াছে। আর বর্ত্তমান ঘটনাটী এখনও যায় নাই। দুটী ঘটনার স্পষ্টতার মাত্রাভেদেই এরূপে সময়ের জ্ঞান জন্মিল। একটী ঘটিয়াছে অতীতে, আর একটী ঘটিতেছে বর্ত্তমানে, ইহার পরে যাহা ঘটিবে, তাহা ভবিষ্যতে। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা আমাদের কাছে এখনও সম্ভাবনা মাত্র; সুতরাং সে সম্বন্ধে আশা আছে মাত্র, স্পষ্ট জ্ঞান নাই, কল্পনাও থাকিতে পারে, কিন্তু কল্পনা সাক্ষাৎ জ্ঞান নহে। যাহা হউক এরূপে বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের বিস্মৃতি ও জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতাই যথাক্রমে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞানের কারণ। আমরা সকল ঘটনা আবার সমান ভাবে স্মৃতিতে রাখিতে পারি না। যেটী স্মৃতিতে যত অস্পষ্ট সেটী তত পূর্ব্বেকার ঘটনা। আবার বিস্মৃতি আমাদের অপূর্ণতার পরিচায়ক। দুটী ঘটনায় সমান ভাবে মনোযোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের অপূর্ণ মানসিক বৃত্তিই আমাদের কাল বা সময়জ্ঞানের কারণ। যে জ্ঞানে বিস্মৃতি নাই, যে জ্ঞানে অস্পষ্ট অনুভূতি নাই, সে জ্ঞানে ত অতীত ও ভবিষ্যৎকাল সম্বন্ধে কোন ধারণাই থাকিতে পারে না। সে জ্ঞানে সকল ঘটনা তুল্যরূপে স্পষ্টভাবে থাকিবে। কাজেই সে জ্ঞানে পূর্ব্ব পশ্চাৎ ভেদ নাই। সুতরাং সে জ্ঞানে কাল বা সময়ের স্বাতন্ত্র্য নাই। আবার কালশূন্য ঘটনা আধারশূন্য আধেয়—ইহা ত আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। সুতরাং পূর্ণজ্ঞানে কোন ঘটনার অস্তিত্বই অসম্ভব। কারণ যাহা কালে ঘটে, যাহা পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহারই নাম ঘটনা।

তেমনি পূর্ণজ্ঞানে বস্তুর অস্তিত্বও অসম্ভব। কারণ বস্তুর অস্তিত্ব দেশে বা স্থানে (space) যাহা সব সময় আমাদের জ্ঞানে থাকে না, যাহা আসে আর যায় তাহাই ত বহির্জ্জগতের বস্তু। বস্তুগুলি আমার সত্তা হইতে স্বতন্ত্রভাবে আছে, এই জ্ঞানেই বস্তুর বস্তুত্ব। যদি আমা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে কিছু আছে এই জ্ঞানই না রহিল, তবে ত বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞানই তিরোহিত হইল। যাহা আমি নহি, তাহাই বাহিরের বস্তু। এরূপ বস্তু-সমষ্টিই বহির্জ্জগৎ নামে অভিহিত। আবার বস্তুসকল আমা হইতে এবং পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র—এই জ্ঞানের নামই দেশ বা স্থানের জ্ঞান। কিন্তু যে জ্ঞানের বাহিরে কিছুই নাই, যে জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র কিছুই থাকিতে পারে না, সে জ্ঞানে কিরূপে বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হইবে? পূর্ণজ্ঞানের বাহিরে ত কিছুই থাকিতে পারে না। সকল বস্তুই ত যুগপৎ পূর্ণজ্ঞানে বিরাজ করিবে। বহির্জ্জগৎ বলিয়া যদি কিছু থাকা সম্ভব হয়, তবে ইহার অন্তর্নিহিত সমুদয় বস্তু একভাবে, একই সময়ে সমান স্পষ্টভাবে, পূর্ণজ্ঞানে অবস্থান করিবে। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান হইতে একটী বস্তুও যখন স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না, তখন বাহিরের বস্তু সমূহই বা কোথায় আর তাহার সমষ্টিভূত বহির্জ্জগৎই বা কোথায়? কাজেই পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞানময় সত্তায় বস্তু বা বহির্জ্জগৎ বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং বহির্জ্জগতের জ্ঞান আমাদের অপূর্ণজ্ঞানসাপেক্ষ। কাজেই পূর্ণজ্ঞানে অন্য কিছুই নাই। আছে শুধু স্বীয়সত্তার জ্ঞান মাত্র।

আচ্ছা, যদি তাহাই হইল, তবে এরূপ পূর্ণসত্তাকে জ্ঞানময় বলিবারই বা প্রয়োজন কি? জ্ঞান ত জ্ঞাতাজ্ঞেয়ের সম্বন্ধসূচক শব্দ মাত্র। যেখানে জ্ঞেয় নাই, সেখানে জ্ঞাতা বা জ্ঞান আছে এ ত সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। সুতরাং ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানময় নহেন। তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলাই চলে না।

আবার প্রেমস্বরূপও নহেন। একমাত্র অব্যক্ত সত্তা ব্যতিরিক্ত যদি আর কিছুই না রহিল, প্রেম দাঁড়াইবে কোথায় ? প্রেমিক ত প্রেমাস্পদকে চায়। না হয় ত 'প্রেম'শব্দের কোন অর্থই থাকে না। ভালবাসিবার যদি কিছুই না রহিল, তবে 'ভালবাসা' শব্দই থাকিতে পারে না। সুতরাং পূর্ণব্রহ্ম প্রেমস্বরূপও নহেন। আবার শক্তিস্বরূপও নহেন ; কারণ শক্তি জ্ঞান ও প্রেমসাপেক্ষ। জ্ঞান ও প্রেমের বিকাশেই শক্তি। যাহা করা হইবে, তাহার পূর্ব্ব জ্ঞান (idea) থাকা চাই এবং তাহাতে আসক্তি চাই, তার পর শক্তির কার্য্য চলিবে ; সুতরাং যে সত্তায় জ্ঞান নাই, প্রেম নাই, তাহাতে শক্তিও নাই। কাজেই ব্রহ্মসত্তায় কোন গুণধর্ম্মের আরোপ করাই চলে না। যত প্রকার গুণধর্ম্মের কল্পনা করা যায়, তাহা শেষ কালে জ্ঞান, প্রেম অথবা শক্তিরূপেই পরিণত হয়। অথবা ইহাদের সংযোগরূপে প্রকাশ পায়। কাজেই ব্রহ্মে কোন প্রকার গুণধর্ম্মই আরোপ করা যায় না। কল্যাণগুণই হউক আর হেয়গুণই হউক পূর্ণ প্রকৃতিতে তাহার কোনটাই নাই। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার গুণবর্জ্জিত অর্থাৎ তিনি নির্গুণ।

এক্ষণে দেখা যাক্ জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মবর্জ্জিত ব্রহ্মবস্তুটী কি ? এরূপ কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ারই বা দরকার কি ? যে সত্তার কোন প্রকার প্রকাশ অসম্ভব, যাহার কোন প্রকার গুণধর্ম্মই সম্ভব নহে, তাহা অস্তিত্ববিহীন, অর্থবিহীন শব্দ মাত্র। গুণধর্ম্মবর্জ্জিত সত্তার অর্থ কি ? এরূপ সত্তা একেবারে অস্বীকার করিলেই বা দোষ কি ? বৌদ্ধগণ বুঝি এই জন্যই শেষে শূন্যবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। বাস্তবিক এরূপ ব্রহ্ম থাকা না থাকা তুই সমান। আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার আমাদের

কোন অধিকার নাই। সুতরাং সংশয়বাদই মায়াবাদের পরিণতি। আচ্ছা, দেখা যাক্ সময় ও কালনিরপেক্ষ কোন বস্তু আছে কি না, যাহা পূর্ণব্রহ্মের জ্ঞেয় বস্তুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সময় ও কালনিরপেক্ষ বহির্জ্জগৎ থাকিতেই পারে না। সুতরাং পূর্ণপ্রকৃতিতে বহির্জ্জগৎ বা বাহিরের বস্তু রূপে কিছুই নাই। তবে থাকিতে পারে, একটা জ্ঞানসাপেক্ষ আদর্শ জগৎ (ideal universe) ইহাই গ্রীক দর্শনের Eternal Logos. দেশকালনিরপেক্ষ অনাদি অনন্ত এই আদর্শ জগৎ পরব্রহ্মের একমাত্র জ্ঞানবস্তু। এই আদর্শ জগৎ বা (Eternal Logosটিই হিন্দুদর্শনের অনাদি অনন্ত সনাতনী মায়া। এ মায়াই ব্রহ্মের প্রকৃতি। এই মায়াই পর-ব্রহ্মের নিত্য-সঙ্গিনী। কিন্তু তিনি তুরীয় বা নির্লিপ্ত অবস্থায় এই মায়া দ্বারা অভিভূত নহেন। উদাসীন থাকিয়া মায়াকে সম্ভোগ করেন এই মাত্র। মায়া দ্বারা যখনই অভিভূত হইলেন, তখনই এক পা নীচে নামিয়া 'ঈশ্বর' আখ্যা গ্রহণ করিলেন। তুরীয় বা নির্গুণ অবস্থায় তিনি একমাত্র এই যোগমায়ায় নিত্য বিরাজিত। এই Eternal logos বা সত্যরূপ যোগমায়াকেই খর্ব্ব করিয়া মিথ্যাভূতা বলা হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা বুঝিবার ভুল। আচ্ছা, দেশকালনিরপেক্ষ এই আদর্শ জিনিসটা কি ? দেশ-কালনিরপেক্ষ জগৎ কিরূপে থাকিতে পারে ? পরমাত্মসাপেক্ষ আদর্শ জগৎই হউক, আর জীবাত্মসাপেক্ষ অপূর্ণ স্থূল জগৎই হউক, ইহা দেশকালে থাকিবেই। তা না হয় ইহাকে জগৎ নামে অভিহিত করাই চলে না। কারণ জগৎ শব্দ দ্বারা বাহিরের বস্তুর সমষ্টি মাত্র বুঝায়। ঠিক তাই। আদর্শ জগৎ বা পরিপূর্ণ জগৎ জীবাত্ম-সাপেক্ষ ব্যবহারিক জগতের ন্যায় হইতেই পারে না। আর ইহাকে

যখন 'আদর্শ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই ব্যবহারিক বা জীবাত্মার ক্ষুদ্র জগৎ হইতে পৃথক্ হইবে। তবে ইহাকে জগৎ বলা হইল কেন, তাহার কারণ আছে। এই আদর্শ জগৎ ক্ষুদ্র জগতের পরিণতি। জীবাত্মসাপেক্ষ ক্ষুদ্র জগৎটী এই পূর্ণ বা আদর্শ জগৎকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। এই আদর্শ জগৎ বাস্তবিক জগতের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। কারণ ইহার আদর্শেই সৃষ্টির প্রারম্ভ, ইহার আদর্শেই জগতের বর্ত্তমান শৃঙ্খলা, আবার ইহাই জগতের পরিণতি। কিন্তু এই বিশ্বের পরিণতি ব্রহ্ম-বস্তু ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ পূর্ণতা একমাত্র ব্রহ্মেই সম্ভব। সুতরাং পূর্ণ জগৎ অর্থে যদি পূর্ণব্রহ্ম না বুঝাইল, তাহা হইলে জগৎকে পূর্ণ বলাই চলে না। তবে কি আদর্শ জগৎ এবং পূর্ণব্রহ্ম একই বস্তুর বিভিন্ন নাম মাত্র? ঠিক তাই। একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুই জগতের প্রারম্ভে, জগতের বর্ত্তমান অস্তিত্বে এবং জগতের অন্তিমে। জীবাত্মার পূর্ণ পরিণতিই সেই পূর্ণব্রহ্ম। পূর্ণ জগৎ, পূর্ণ আত্মা ও পূর্ণব্রহ্ম একই বস্তুর তিনটী রূপ। ইহাই গ্রীকদর্শনের ত্রিত্ববাদ। এক ব্রহ্মের তিনটী গুণ বা প্রকৃতি। এই গ্রীকদর্শনে ও হিন্দুদর্শনে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। খৃষ্টধর্ম্ম এই সূক্ষ্ম গ্রীকদর্শনের স্থূল আবরণ। খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ গ্রীকদর্শন-সম্ভূত হইলেও এত স্থূলভাব ধারণ করিয়াছে যে, তাহাতে ব্রহ্মসত্তার Unity বা পূর্ণতা Trinity বা ত্রিত্ববাদের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। তাই খৃষ্টানদিগের ঈশ্বর স্বর্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট। মানুষের ন্যায় তাঁহার ভুল ভ্রান্তি, ক্রোধ অভিশাপ সকলই সম্ভব। যাহা হউক এক্ষণে দেখা গেল যে, পূর্ণব্রহ্মের জ্ঞেয় বস্তু রূপে এক আদর্শ জগৎ রহিয়াছে। ইহাও আবার পূর্ণব্রহ্মের নামান্তর রূপে

দেখা দিল। এরূপে পূর্ণ জীবাত্মাও তাঁহার আর একটী নাম। সুতরাং ব্রহ্ম আপনার নির্ব্বিকল্প অবস্থায় একমাত্র আত্মস্বরূপেই তৃপ্ত। তিনি নিজে নিজকে দেখিয়াই মুগ্ধ; আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি আত্মহারা! তিনি আপনাকেই আপনি সম্ভোগ করেন। আবার তাঁহার কর্ম্ম-শক্তির পরিচয় আপন সত্তাকে লইয়া। আপনাকে কর্ম্ম-শক্তিরূপে প্রকাশ করিতে গিয়াই, তিনি ঈশ্বররূপে বিশ্বমূলে অবতীর্ণ। ইহাই ত জগৎ-সৃষ্টির মূল সঙ্কেত। আচ্ছা এক্ষণে বুঝা গেল যে, পূর্ণব্রহ্মের জ্ঞানবস্তু রূপে—ভোগ্যবস্তুরূপে একমাত্র তিনি নিজেই রহিয়াছেন। অন্য কোন পদার্থের পূর্ণদেবের পূর্ণমন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তিনি তথায় আত্মতৃপ্ত ও আত্মদর্শী। ইহাই তাঁহার তুরীয় স্বরূপ। তবে কি জীব জগৎ মিথ্যা? অথবা ইহা কি অন্য কোন শক্তিসম্ভূত? সাঙ্খ্যদর্শন বলেন, প্রকৃতি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি। ইহাতে কিন্তু কিছুই বুঝা গেল না। প্রকৃতি যদি ব্রহ্মবস্তু হইতে স্বতন্ত্র কিছু হইল, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তুর আর পূর্ণতা রহিল না। এরূপ কোন স্বাধীন সত্তায় আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। সাংখ্যদর্শনের সমালোচনায় ইহা আমরা বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। বাস্তবিক জগৎ মিথ্যা নহে। পূর্ণব্রহ্মের আর এক শক্তি রহিয়াছে যে, তিনি স্বয়ং এক অদ্বিতীয় থাকিয়াও অসংখ্য জ্ঞানময় ও প্রেমময় সত্তারূপে আপনাকে ব্যক্ত করিতে সক্ষম। তাই তিনি আবার ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। আবার তিনিই অপূর্ণ জীবাত্মা। তাঁহার পূর্ণসত্তা যেরূপ সত্য, তাঁহার এই বিভিন্ন সত্তাও তেমনি সত্য। তিনি নিত্যলীলাময়। এই লীলা তাঁহার চিরন্তন স্বরূপ। তাই তিনি পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন। এই লীলা হইতেই দেশকালনিবদ্ধ

বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি। তিনি ঈশ্বররূপে, হিরণ্যগর্ভরূপে এবং জীবাত্মারূপে অসংখ্য ভাবে এই বিশ্বের ভোক্তা। কিন্তু তাঁহার পূর্ণ সত্তায় এই অপূর্ণ বিশ্বের অস্তিত্ব নাই। তাই এই অপূর্ণ বিশ্বকে মায়িক বা অসত্য বলা হইয়াছে। তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানের বস্তুরূপে যে আদর্শ জগৎ রহিয়াছে, তাহা তাঁহার আত্মরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিশ্বের অপূর্ণ বা মায়িক-সত্তাও এক অর্থে পারমার্থিক। কারণ যাহা পরম পুরুষের পরাজ্ঞানে অবস্থিত তাহাই পারমার্থিক। ব্রহ্ম আপন পূর্ণসত্তায় আত্মতৃপ্ত, আত্মপ্রেমিক এবং আত্মদর্শী হইয়াও আপন লীলাময়ী প্রকৃতির প্ররোচনায় অসংখ্য পুরুষরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। অসংখ্য পুরুষরূপে তিনি এই বিশ্বকে নানারূপে নানা ভাবে দর্শন ও সম্ভোগ করিতেছেন। শুধু তাহা নহে; আপনার তুরীয় অবস্থায়ও স্বীয় বিচিত্র লীলা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান না থাকিয়া পারে না। তিনি যে অসংখ্য পুরুষরূপে এই বিশ্বকে অসংখ্যভাবে দর্শন ও সম্ভোগ করিতেছেন, ইহা তাঁহার সুস্পষ্ট জানা আছে। সুতরাং তাঁহার পরাজ্ঞানেও এই বিশ্বপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব রহিয়াছে। এবং ইহা তাঁহারই ইচ্ছাপ্রসূত। কারণ তাহা না হইলে তাঁহার জ্ঞান বা ইচ্ছার পূর্ণতাই বজায় থাকে না। ইহাই দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত। ইহাই মায়া ও পরমার্থের মিলনভূমি। আবার এই মিলনভূমিতেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চরম সিদ্ধান্তের সম্মিলন। পাশ্চাত্য দর্শনের শেষ মীমাংসা Knowing and Being are identical অর্থাৎ বিশ্বকে আমরা জীবরূপে যে ভাবে দেখিতেছি, ইহা ব্রহ্মের পরাজ্ঞানেও ঠিক সেই ভাবেই আছে। ইহা তাঁহাদের একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে শঙ্করপন্থিগণ যে জগৎকে মায়িক বা ব্যবহারিক বলিয়া সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন নহে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম যেমন তুরীয়স্বরূপে এক অদ্বিতীয়, নির্গুণ, নিরবয়ব থাকিয়াও লীলাময়ী সত্তায় বহুরূপী, বিশ্বও তদ্রূপ পূর্ণ পুরুষের ভোগ্য বস্তুরূপে তাঁহার সত্তায় একীভূত থাকিয়াও লীলাময় বহুরূপী পুরুষের ভোগ্যবস্তুরূপে বহুভাবে প্রকটিত।

আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, কয়েকটী সমস্যার কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়াই অদ্বৈতবাদিগণ ঘোর মায়াবাদের বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছেন। প্রথম সমস্যা ব্রহ্মের পূর্ণত্ব ও বিশ্বের অস্তিত্বের সামঞ্জস্য লইয়া। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব-প্রপঞ্চ কোথা হইতে আসিল? ইহা কি আত্মস্থ (self-existent) না ব্রহ্মগত? ইহা কি স্বাধীন না ব্রহ্ম-প্রকৃতির অধীন? বিশ্বকে স্বাধীন বলিবার যো নাই। তাহা হইলে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব আর বজায় থাকে না। পূর্ণ-ব্রহ্ম-সত্তার বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মের অস্তিত্ব ইহা দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। পূর্ণত্ব সর্ব্বগ্রাসি। জগৎকে যদি স্বাধীন বলা যায়, ব্রহ্মকে অসীম না বলিয়া সসীম বলিতে হয়। আবার অন্য দিকেও আর এক বিপদ। যদি বলি জগৎ ব্রহ্ম-সত্তার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম-সত্তার অন্য একটা দিক্, ইহাতে অন্য এক জটিল সমস্যা আসিয়া পড়ে। জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। প্রতিমুহূর্ত্তে ইহার অন্তর্ভুক্ত ঘটনারাশির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ইহার মধ্যে ত কত পাপ তাপ, কত রোগ শোক, কত জন্ম মৃত্যু, কত দুঃখ যন্ত্রণা রহিয়াছে। সুতরাং কিরূপে বলা যায় যে, এমন একটা জিনিস ব্রহ্ম-সত্তার অন্তর্ভুক্ত? ব্রহ্ম পূর্ণ, নিত্য ও নির্ব্বিকার। ব্রহ্ম প্রকৃতিতে এরূপ অপূর্ণতা থাকা অসম্ভব। সুতরাং ব্রহ্মের পূর্ণত্ব স্বীকার করিতে হইলে, জগৎকে মিথ্যা বলিতে হইবে। জীবাত্মার অস্তিত্ব লইয়া আর এক সমস্যা। ইহাও

বিশ্বের ন্যায় হয় ব্রহ্ম-সত্তার বাহিরে, না হয় ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও দুদিকে বিপদ। জীবাত্মার স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিতে হইলে ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করা হয়। আবার যে জীবাত্মার মধ্যে এত অপূর্ণতা, এত পাপ-তাপ, এত অজ্ঞানতা, তাহাকে কি করিয়া ব্রহ্ম-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়? সুতরাং জীবাত্মাও মিথ্যা। কাজেই জীবাত্মার অস্তিত্বজ্ঞানও মায়া-সম্ভূত। এই জন্যই বোধ হয়, তাঁহারা পরব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আর সকলকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কি করিয়া যে ব্রহ্ম পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণ বিশ্ব-আকারে আপনাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইলেন, পূর্ণ ও অপূর্ণের এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য কি করিয়া সম্ভব হইল ইহার সম্যক্ মীমাংসা করিবার জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদের (idealism) সৃষ্টি হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ইমেনুয়েল কেণ্টই এই বিজ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠাতা। লক্ ও হিউমের অজ্ঞেয়বাদের মধ্যেও ইহার অঙ্কুর পাওয়া যায় বটে; কিন্তু কেণ্টই এই মত পরিপুষ্ট আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বহির্জ্জগতে যাহা কিছু জ্ঞান আমরা লাভ করি আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানই তাহার মূল উপাদান। এই ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সহিত দেশ কাল প্রভৃতি আমাদের নিজস্ব কতকগুলি মৌলিক ভাবের (fundamental ideas) সংযোগে এই বহির্জ্জগৎ গঠিত হইয়াছে। বহির্জ্জগতের জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ হইলেও আমাদের এই স্বতঃসিদ্ধ (self-evident) ভাবগুলির অভাবে ইহার সম্ভাবনা থাকিত না। সুতরাং এক অর্থে আমরাই আমাদের বহির্জ্জগতের স্রষ্টা। এতদ্ব্যতীত আর যদি কিছু থাকে তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বাহিরে যাইবার আমাদের কোন শক্তি নাই। আমার জগৎ আমার জ্ঞান-

সাপেক্ষ বলিয়া বস্তুর প্রকৃত সত্তা আমাদের চির অজ্ঞাত। মানবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কেণ্ট অজ্ঞেয়বাদী। আমরা মানবাত্মা সম্বন্ধে যতদুর জানি, তাঁহার মতে তাহা একটা শুধু ভাবসমষ্টি (aggregate of ideas) বা চিন্তাস্রোত ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেণ্ট আপনার Critique of practical reason নামক অধ্যায়ে আত্মা ও ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে যেন শুধু দায়ে ঠেকিয়া মানিয়া লওয়া। জ্ঞানে তাহার ভিত্তি নাই। সত্যনির্দ্ধারণের বেলা যাহাকে অস্বীকার করিয়াছেন, পরে গায়ের জোরে তাহাকে মানিয়া নিলে চলিবে কেন? যাহা হউক হেগেল, ফিকৃটে প্রভৃতি তাঁহার পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই সংশয়বাদের পরপারে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহার সংশয়বাদ দূর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ইংরেজ পণ্ডিত কেয়ার্ড ও গ্রীন এই বিজ্ঞানবাদকে আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কি উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এসকল জটিল সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইলেন, তাহা আলোচনা করা এ প্রবন্ধে সম্ভব হইবে না। শুধু মোটামোটি সিদ্ধান্তগুলিই এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহাদের মতে এই বিশ্ব একটা বিজ্ঞানসমষ্টি (aggregate of ideas) ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক পূর্ণ জ্ঞানময় সত্তায় ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। বিশ্বের যে অংশ আমাদের জ্ঞানগোচর তাহা যেমন আমাদের বিজ্ঞানসমষ্টি মাত্র, সমগ্র বিশ্বও তেমনি সেই সীমাহীন বা পরিপূর্ণ জ্ঞানে এক বিরাট্ বিজ্ঞানসমষ্টি রূপে অবস্থান করিতেছে। শুধু পূর্ণতাই যে এই শক্তির প্রকৃতি তাহা নহে। নিজে পূর্ণ থাকিয়াও এই মহাশক্তি বিশ্বের অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়া আপনাকে সসীম আকারে ব্যক্ত করিতে সক্ষম। এই মহাশক্তিই

এদেশে ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। এই শক্তিস্বরূপ ব্রহ্ম সত্তায় পূর্ণ, নিরবয়ব ও নির্ব্বিকার। লীলায় কিন্তু অপূর্ণ সাবয়ব ও সবিকার। আপন জ্ঞানময়ী সত্তার বিজ্ঞানসমষ্টিকে অসংখ্য জড়বস্তুরূপে আমাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। আবার এই অসংখ্য জড়বস্তুকে আপন সত্তায় একসূত্রে গাঁথিয়া বিরাট্ বিশ্বের সৃজন করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব ক্ষমতাবলে তিনি আপনাকে অপূর্ণ মানবাত্মারূপে ব্যক্ত করিতেও সমর্থ। জগৎ ও মানবাত্মা মিথ্যা নহে। তবে জগৎ বিজ্ঞানসমষ্টিরূপে সত্য। আর জীবাত্মা পূর্ণব্রহ্মের অপূর্ণ প্রকাশরূপে সত্য। জগৎ ও জীবাত্মা উভয়ই ব্রহ্মসাপেক্ষ, অর্থাৎ স্বাধীন নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। মূলে দুই-ই এক জিনিস। এক অখণ্ড সত্য বস্তুর দুইটী বিভিন্ন দিক্ মাত্র। পরমাত্মা যখন জীবদেহের সীমার মধ্যে থাকিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে যান, তখনই তিনি জীবাত্মা রূপে প্রকাশ পান। কিরূপে ব্রহ্ম পূর্ণ ও নির্ব্বিকার থাকিয়াও অসংখ্য ঘটনারাশি সৃজন করিতে সমর্থ, তাহা জীবাত্মার কার্য্য হইতে অনেকটা বুঝা যায়। আমরা চিন্তারাজ্যে ও জড়রাজ্যে প্রতিনিয়ত কত ঘটনারাশি সৃজন করিতেছি। ইহাতে কিন্তু আত্মবস্তুর কোন বিকৃতি ঘটিতেছে না। কর্ত্তা চিরদিন এক। আমি সেই চির পুরাতন আমি। আত্মবস্তু যদি প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে অনিত্যকে অনিত্য বলিয়া চিনিয়া লওয়া ইহার পক্ষে সম্ভব হইত না। অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের কল্পনা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। সর্ব্বোপরি নিত্যতা ও পূর্ণতার যে ধারণা প্রাণে প্রাণে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। সুতরাং জীবাত্মা যেরূপ নিত্য ও নির্ব্বিকার থাকিয়াও চিন্তারাজ্য ও জড়রাজ্যে অনন্ত ঘটনাস্রোত সৃজন করিতেছে, পরমাত্মাও তদ্রূপ আত্মসত্তায় সম্পূর্ণ

ও নির্ব্বিকার থাকিয়াও অনন্ত ঘটনাস্রোত সৃজন করিতে সমর্থ। তিনি অনন্ত কাল ধরিয়া অসংখ্য ঘটনাকে একসূত্রে গাঁথিয়া আপন জ্ঞানময়ী সত্তায়, ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। শুধু যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদিগণ এই মহাসত্যে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা নহে ; এদেশের মনীষিগণও এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তাই উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন :—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

—১ম মুণ্ডক ১ম খণ্ড।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।

—২য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো-
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

—কঠোপনিষদ।

প্রতীচ্য অদ্বৈতবাদ।

প্রতীচ্য অদ্বৈতবাদ প্রাচ্য অদ্বৈতবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ জগৎকে মিথ্যা বা মায়াসম্ভূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে একমাত্র পূর্ণব্রহ্মই সত্যবস্তু। আর যাহা কিছু দেখা যায় তাহা সমস্তই মায়ার খেলা মাত্র। পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদিগণ কিন্তু জগৎকে এরূপ অসত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহাদের মতে জগৎ ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ। জগতের যাবদীয় বস্তুর পশ্চাতে এক নিত্য পূর্ণশক্তি রহিয়াছে এবং তাহা হইতেই এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে। এই শক্তি এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও অসংখ্য বস্তুরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে। পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদিগণ অবশ্যই স্বীকার করেন, যে মহাশক্তি বিশ্বের মূলে থাকিয়া অসংখ্য বস্তু ও ঘটনাবলীরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে, তাহা একটী অন্ধশক্তি মাত্র নহে। ইহা সজ্ঞান চৈতন্যময়ী শক্তি। কিন্তু তাঁহারা যদিও এই মহাশক্তিকে পূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহাদের মতে এই শক্তি বিশ্বব্যাপারে সমগ্রভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশ্বের বাহিরে বা সৃষ্টি ব্যতিরিক্ত ইহার অন্য কোন সত্তা নাই। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে তাঁহারা স্রষ্টাকে সৃষ্টির সহিত অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই রাখেন নাই। তাঁহারা এই শক্তিকে সম্পূর্ণ immanent বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এক ব্রহ্মশক্তিই জড়জগতে

জড়শক্তিরূপে, উদ্ভিজ্জগতে জীবনীশক্তিরূপে, প্রাণীজগতে সজ্ঞানশক্তি-রূপে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। অপর কথায় বলিতে গেলে তিনি জড়পদার্থরূপে, উদ্ভিদ্‌রূপে ও প্রাণীরূপে এই বিশ্বের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। মনুষ্যজীবন এই ব্রহ্মশক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। মানবজীবন শুধু চৈতন্যময়ী ও ভাবময়ী শক্তি নহে। মানুষ আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন। এরূপে জগৎ জড়ত্বের রাজ্য হইতে চৈতন্যরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিশ্বের এই বিকাশ বিবর্ত্তনের নিয়মানুসারেই সংঘটিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে ব্রুণো (Bruno) এবং স্পিনোজাই (Spinoza) এই অদ্বৈতবাদের প্রধান পরিপোষক। মহর্ষি স্পিনোজা যেরূপ ভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিলে এই মতটী স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিব। তাঁহার মতে বিশ্বের মধ্য দিয়া যে মহাশক্তি আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে তাহা পরিপূর্ণ ও অদ্বিতীয়। এই মহাশক্তিকে তিনি মৌলিক বস্তু (Substance) নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরে নীতিবিজ্ঞানে ইহাকে ঈশ্বর নামেও অভিহিত করিয়াছেন। এই Substance বা মৌলিক বস্তুর অসংখ্য attributes বা গুণ রহিয়াছে; আমরা ইহার মধ্যে দুইটী মাত্র উপলব্ধি করিতে পারি। এক চিন্তাশীলতা (thought) আর এক ব্যাপকতা (Extension). একই ব্রহ্মবস্তু আপনাকে এই দুই শক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্যাপকতার রূপভেদ হইতে অসংখ্য জড়পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি এই ব্যাপকতারই বিভিন্ন প্রকাশ। আবার এই ব্রহ্মশক্তি আপনাকে চিন্তাশক্তিরূপেও প্রকাশ করিয়াছেন। জগতের অসংখ্য জীব এই চিন্তাশক্তিরই প্রকাশ। মানুষ

চিন্তাশীল জীব। এই চিন্তাশীলতা ভগবৎপ্রকৃতি-সম্ভূত। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে স্পিনোজার মতে ব্রহ্ম বিশ্বের নানা বস্তু ও জীবের সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। স্পিনোজার মতে ভগবানের বিশ্বাতীত কোন সত্তাই নাই। তাঁহার সমগ্র শক্তি বা অস্তিত্ব বিশ্বব্যাপারে নিয়োজিত হইয়াছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'বিশ্বই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই বিশ্ব'।

এই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে ইহা ব্রহ্মকে পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলীর সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে পূর্ণ ও অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করেন বটে, কিন্তু নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বের সহিত তাঁহাকে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা পূর্ণ তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে বিশ্বের ঘটনাসমষ্টির সহিত এক করিতে গিয়া তাঁহার পূর্ণতা বজায় রাখিতে পারেন নাই। বিশ্ব প্রতিমুহূর্ত্তেই দেশকালে সীমাবদ্ধ। ইহাকে কিছুতেই পরিপূর্ণ বলা যায় না। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাসমষ্টিতে পূর্ণতার আরোপ কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। এরূপে অদ্বৈতবাদিগণ যখন ব্রহ্মকে বিশ্বের অসংখ্য বস্তু ও জীবের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহাকে পূর্ণ বলিবার তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। যে শক্তি এই দেশকালনিবদ্ধ সসীম বিশ্বেই নিঃশেষিত হইয়াছে তাহাকে কিছুতেই পূর্ণ বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই মুহূর্ত্তেই যদি ব্রহ্মের সমস্ত শক্তি বিশ্বব্যাপারে ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে বিশ্বের আর অধিকতর বিকাশের সম্ভাবনা থাকে না। যদি সমস্ত শক্তিই বর্ত্তমানে নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর শক্তি কোথা হইতে আসিবে? বিশ্ব

চিরদিন এক ভাবে রহিয়াছে বলিতেই হইবে। ভবিষ্যতেও ইহা এই ভাবেই থাকিবে। কোন প্রকার পরিবর্ত্তনই সম্ভব হইবে না। তৃতীয়তঃ, অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মসত্তায় চরিত্রের পূর্ণতা আরোপ করিতে পারেন না। কারণ অপূর্ণ বিশ্বে কখনও পূর্ণ মঙ্গলের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। মানবজীবনই যখন তাঁহাদের মতে ব্রহ্মশক্তির শ্রেষ্ঠতম পরিণতি, তখন কিছুতেই তাঁহাতে পূর্ণ সাধুতার আরোপ করা যায় না। মানুষ ত চিরদিনই অপূর্ণ। সুতরাং বলিতে হইবে যে স্রষ্টার নৈতিক চরিত্র চিরদিন সঙ্কীর্ণ। তিনি মানুষ রূপে দিন দিন উন্নততর সত্তা লাভ করিতেছেন এইমাত্র বলা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, ব্রহ্ম প্রকৃতিতে এরূপ অপূর্ণতার আরোপ করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ মানবজীবনের মহান্ আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। মানবজীবন যে যুগ যুগান্তর ধরিয়া পূর্ণ সাধুতার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাকে সঙ্কীর্ণ করিতে গেলে মানবের নৈতিক জীবন ভিত্তিহীন হইয়া যায়। তাহা হইলে বলিতে হয় মানবজীবন শুধু ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইবে। উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্ম লইয়া মানবজীবন শুধু পরিবর্ত্তনশীল জগতে অধিকতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে এইমাত্র। এই পরিবর্ত্তনের কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য নাই। পঞ্চমতঃ, স্পিনোজার ব্রহ্ম প্রকৃতির বিশ্লেষণ সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। একই ব্রহ্ম প্রকৃতি দুটী পরস্পর বিরোধী গুণের সংযোগমাত্র একথা বলা নিতান্তই অযৌক্তিক। ফলতঃ thought বা চিন্তাশীলতা এবং extension বা ব্যাপকতা দুটী পৃথক্ গুণ নহে। ব্যাপকতা চিন্তাশক্তিরই প্রকাশ মাত্র। কারণ ব্যাপকতার ধারণা চিন্তাসাপেক্ষ।

যাহা হউক এক্ষণে দেখা গেল যে পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদও প্রাচ্য

অদ্বৈতবাদের ন্যায় একদেশদর্শিতায় পূর্ণ। পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নাই। তাঁহারা ব্রহ্মের সমগ্র শক্তি বিশ্বব্যাপারে নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা এরূপে ব্রহ্মের পূর্ণতা বজায় রাখিতে পারেন নাই। ব্রহ্ম প্রকৃতিতে এরূপ অপূর্ণতার আরোপ করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ মানবজীবনের মহান্ আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। এ সকল বিষয় আমরা যথাস্থলে আলোচনা করিয়াছি। আত্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্বের যে সকল জটিল সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া তাঁহারা এরূপ একদেশদর্শী হইয়া দাঁড়াইলেন, দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ সে সকল সমস্যার মীমাংসা করতঃ কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অলোচনার প্রারম্ভেই আমাদের বক্তব্য এই যে আমরা এই মতের পক্ষ অবলম্বন করিয়াই জড়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সমালোচনা করিয়াছি। কারণ আমাদের মতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত ও দোষবর্জ্জিত। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণই সবদিকে দৃষ্টি রাখিয়া এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তজ্জন্য আমরা প্রথম হইতেই নানা প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্ত বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে সে সকল বিষয়ের পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। কিরূপে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ সমূহে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে আমরা সংক্ষেপে সে সকল সিদ্ধান্তের মোট কথাগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিমূলে এক মহাশক্তি বিরাজ করিতেছে। এই এক অখণ্ড ও পরিপূর্ণ মহাশক্তি হইতেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রপঞ্চের উদ্ভব হইয়াছে। সৃষ্টির যাবদীয় বস্তু এই শক্তিকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু জড়বাদিগণের ন্যায় ইঁহারা এই শক্তিকে অন্ধশক্তি বা জড়শক্তি বলেন না। তাঁহাদের মতে এই শক্তি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন। ইহাতে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার সমন্বয় রহিয়াছে। জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির সমন্বয়ে ইঁহার প্রকৃতি গঠিত বলিয়া ইঁহাকে পরমপুরুষ বলিয়া অভিহিত করা হয়। তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছার বাহিরে একটী পরমাণুও থাকিতে পারে না।

দেশভেদে এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদও দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের ন্যায় কতকটা পৃথক্ আকার ধারণ করিয়াছে। তবে এই পার্থক্য এই সিদ্ধান্তের উৎপত্তি ও প্রণালীর বিশেষত্ব লইয়া। প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না। আমরা ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। উপসংহারে ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহাও বিবৃত করিব।

শ্রীসম্প্রদায় নামধেয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্য এদেশে দ্বৈতাতৈবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। প্রথিতনামা শঙ্করাচার্য্যের অব্যবহিত পরেই তিনি আবির্ভূত হন। তিনি বেদান্ত-সূত্রের যে বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা শ্রীভাষ্য নামে পরিচিত। এই শ্রীভাষ্যে তিনি শঙ্করের এক শেষ অদ্বৈতবাদের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিশেষ্টাদ্বৈতবাদ নামে সর্ব্বত্র বিদিত। কিন্তু ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে রামানুজ স্বামী আবির্ভূত হওয়ার বহুপূর্ব্বে এদেশে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এমন কি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের পূর্ব্বে না হউক ইহার প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ উপনিষদ বা বেদান্তের সতেজ ভাষায় ইহা বিবৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যদিও শঙ্করাচার্য্য এই বেদান্ত গ্রন্থ সমূহ হইতেই স্বীয় অদ্বৈতবাদের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এই গ্রন্থগুলি শান্ত ভাবে পাঠ করিলে ইহাতে উৎকট অদ্বৈতবাদের নাম গন্ধও আছে বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষি নিম্বাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত ঋষি-সম্প্রদায় নামধেয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় উপনিষদনুযায়ী দ্বৈতাদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

মহর্ষি নিম্বাদিত্য কত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা

নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে তিনি দেবর্ষি নারদের শিষ্য বলিয়াই সর্ব্বত্র বিদিত। তাঁহার অপর নাম আচার্য্য নিয়মানন্দ। ইহাদ্বারা ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে তিনি যে বহু প্রাচীন ইহা সপ্রমাণ হয়। মহর্ষি বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের যে সংক্ষিপ্ত ভাষ্য তিনি রচনা করেন, তাহাতে ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের আদিগুরু একথা অনেকেই স্বীকার করিতে নারাজ। সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই ঋষি চতুষ্টয় এই মতের আদি আচার্য্য। দেবর্ষি নারদ ইহাঁদের নিকট অধ্যাত্ম বিদ্যা শিক্ষা করেন। মহর্ষি নিম্বাদিত্য তাঁহারই শিষ্য।—বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে নিম্বাদিত্য স্বয়ং একথা ব্যক্ত করিয়াছেন।* ইহাতে বুঝা যাইতেছে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এদেশের প্রাচীনতম দার্শনিক মত। মহর্ষি বাদরায়ণের মূল ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিলে এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদই যে তাঁহার অভিপ্রেত তাহা সহজে বোধগম্য হয়। ভগবদ্গীতা গ্রন্থেও এই মত বিবৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য অবশ্যই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে কিন্তু অনেকটা বিকৃত ব্যাখ্যা। মহর্ষি বাদরায়ণকে যদি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে নিম্বাদিত্যকে তাঁহারই অনুসরণকারী বলিতে হয়। কারণ তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং নারদের পর মহর্ষি বাদরায়ণকেই এই সিদ্ধান্তের প্রধান আচার্য্য বলিতে হয়। সে যাহা হউক, নিম্বাদিত্যের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপী। তিনি একদিকে পূর্ণস্বভাব বলিয়া তাঁহাতে গুণ ও গুণী বলিয়া কোন পার্থক্য

---

* বেদান্তসূত্র ১ম অঃ ৩য় পাদ ৮ম সূঃ।

সম্ভব নহে। তাঁহার গুণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকাতে তিনি নির্গুণ। আবার নির্গুণ বা গুণাতীত হইয়াও আপনাকে বিশ্বরূপে প্রকটিত করতঃ সগুণসত্তা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণ। আবার গুণ সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করে। সুতরাং সত্তা গুণাতীত। কিন্তু গুণ গুণী হইতে অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ দুই প্রকৃতি। ইহা আপাততঃ স্ববিরোধী কথা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে ইহাই সমীচীন বলিয়া অনুভূত হয়। নির্গুণ বলিলে যে ব্রহ্ম প্রকৃতির সবটা বলা হইল তাহা নহে। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণস্বরূপ পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞস্বভাব। সৃষ্টি কার্য্য তাঁহার প্রকৃতির সহিত নিত্য বিজড়িত। তিনি যে কখনও কর্ম্মশীল কখনও বা উদাসীন এরূপ সিদ্ধান্ত একান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ। জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। ব্রহ্মই এই পরিবর্ত্তনের নিত্য উপাদান ও নিত্যকারণ। তবে ব্রহ্মই যখন এই বিশ্বের উৎপত্তি ও পরিণতির একমাত্র কারণ, তিনি যে বিশ্বাতীত হইয়াও অবস্থান করিতে-ছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ তিনি বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতির কারণ হইলেও ইহার সহিত সম্পূর্ণ একীভূত নহেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে গুণ গুণী হইতে স্বতন্ত্র নহে; অথচ গুণী স্বয়ং গুণাতীত। সোজা কথায় বলিতে গেলে, তিনি আপন সত্তায় নিত্য, অদ্বৈত ও পরিপূর্ণ হইয়াও জগৎ ব্যাপারে আপনাকে বিচিত্রভাবে প্রকটিত করিতেছেন। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণের বিকারভূত। ব্রহ্ম মূলসত্তায় ত্রিগুণাতীত। কারণ ত্রিগুণ তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত, এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। ইহাই নিম্বাদিত্যের ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। ইহা মহর্ষি বাদরায়ণেরও

চরম সিদ্ধান্ত। নিম্বাদিত্য বেদান্ত দর্শনের বহু সূত্রের ব্যাখ্যায় এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন।

নিম্বাদিত্যের মতে জীব ব্রহ্মের অংশ, সুতরাং তাঁহা হইতে অভিন্ন। কিন্তু অংশ ও অংশীতে কথঞ্চিৎ পার্থক্যও স্বীকার করিতে হইবে। যদি ভেদই না থাকিবে তবে তাহাকে অংশ না বলিয়া পূর্ণব্রহ্মই বলা হইত। জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও পরমাত্মা জীবকৃত দুষ্কৃতির ভোক্তা নহেন। বেদান্তসূত্রে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। সূর্য্যকিরণ ধরাপৃষ্ঠে পুরীষাদির সংস্পর্শে অপবিত্র হইলেও সেই অপবিত্রতা সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না। জীবের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা অসম্ভব। সুতরাং জীব ব্রহ্মস্বভাব হইলেও বিভু নহে। জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। সূর্য্য এক হইয়াও যেমন বিভিন্ন পাত্রস্থিত জলে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পান, তদ্রূপ ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হইয়াও অসংখ্য জীবরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবসমূহ আবার দেহভেদে পরস্পর হইতে বিভিন্ন।

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা নিম্বাদিত্যের আত্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব সংঘটিত সিদ্ধান্তগুলি মোটামোটি বুঝিতে পারিলাম। এই প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা অসম্ভব। তজ্জন্য সমগ্র বেদান্ত দর্শনের বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে এক বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রী-সম্প্রদায় নামধেয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্য নিম্বাদিত্যের বহু শতাব্দী পরে প্রাদুর্ভূত হইলেও তিনিই এদেশে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য্য বলিয়া পরিচিত। কারণ নিম্বাদিত্যের বিচার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সুতরাং দুরভিগম্য। তজ্জন্যই তাঁহার প্রতি অনুরাগী দার্শনিক পণ্ডিতের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তাঁহার সহিত পরিচিত

হওয়ার অধিকার অল্পলোকেরই আছে। আচার্য্য রামানুজ স্বপ্রণীত শ্রীভাষ্যে শঙ্কর দর্শনের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু পাণ্ডিত্য হিসাবে তাঁহার স্থান শঙ্করাচার্য্যের বহু নিম্নে। রামানুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ অর্থাৎ উভয়রূপী। তবে নির্গুণ শব্দের তিনি অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম 'নিখিলহেয়প্রত্যনীকঃ', তাই তিনি নির্গুণ। অর্থাৎ তাঁহাতে হেয় গুণের লেশমাত্র নাই। আবার সমস্ত কল্যাণগুণের আকর বলিয়া তিনি সগুণ। ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা ও মূল উপাদান। তিনি নিত্য-ক্রিয়াশীল ও নিত্য-মায়াময়। তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতে স্থিতি ও পরিণতি। তিনি এক অদ্বিতীয় থাকিয়াও মায়াবলে জগতের সৃষ্টি করেন। কল্পান্তে তাহার সংহার করিয়া আবার আপন স্বরূপে অবস্থান করেন। সমগ্র বিশ্ব ও জীব তাঁহার সত্তায় বিলীন হইয়া যায়। আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ব্রহ্মকে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বলিলে ইহা বুঝায় না যে একমাত্র তিনিই সত্য আর সমস্তই মিথ্যা। ইহাতে শুধু এইটুকু মাত্র বুঝায় যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা ব্রহ্ম-সাপেক্ষ। তিনিই সমগ্র বিশ্বের মূল উপাদান এবং প্রলয়ে সমস্ত তাঁহাতেই বিলীন হয়।

অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে একমাত্র সত্যবস্তু বলিয়াছেন, জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ই সত্য। ব্রহ্ম আদি সত্য, জগৎ ব্রহ্মসাপেক্ষ। অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বকে তটস্থ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ তাঁহাকে শুধু 'সত্যং জ্ঞানমমৃতং' বলিয়াছেন। রামানুজের মতে ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তির নামই মায়া। মায়া অবিদ্যা বা মিথ্যা নহে।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে তিন পদার্থই সত্য। এই তিন পদার্থ ব্রহ্ম, জীব

ও জড় পদার্থ। ইহার মধ্যে জড় ভোগ্য, জীব ভোক্তা, এবং ব্রহ্ম নিয়ন্তা। জীবের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিলেও ইহার মৌলিক সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। ইহার অস্তিত্ব ঈশ্বরাধীন। প্রকৃতি ও পুরুষ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। তিনিই ব্রহ্ম.—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যস্য পৃথিবী শরীরং, যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, য আত্মনি তিষ্ঠন্ যস্যাত্মা শরীরং।"

এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন,—'প্রলয়ে যখন সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মে বিলীন হয় তখন ব্রহ্মের সূক্ষ্মাবস্থা বা কারণাবস্থা। আবার সৃষ্টিকালে যখন ব্রহ্ম স্থূল অবস্থা ধারণ করেন, তখন তাঁহার স্থূল বা কার্য্যাবস্থা। সে অবস্থায় ব্রহ্ম জড়জগৎ, ভোগ্য বিষয় ও ভোগোপকরণ-বিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, জগতের যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই অবস্থিতি ইহাকে মিথ্যা বলিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদিগণ বলিবেন জগৎ নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল। প্রতি মুহূর্ত্তেই ইহার বিকৃতি ঘটিতেছে। সুতরাং ইহাকে ব্রহ্মসত্তার সহিত তুলনা করা যায় না। কারণ ব্রহ্মপ্রকৃতি নিত্য, শাশ্বত এবং অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জগৎকে মায়ার বিজৃম্ভণ বলা ঠিক নহে। ইহাকে রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় অলীক বস্তু বলা সঙ্গত নহে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ নানা শ্রুতিবাক্যের সাহায্যে সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে জ্ঞান যখন বিষয়-সাপেক্ষ, অর্থাৎ যখন কোন না কোন বাহ্যবস্তু ভিন্ন জ্ঞানের উদয় অসম্ভব তখন বাহ্যবস্তুকে মিথ্যা বলিলে জ্ঞানবস্তুকেও মিথ্যা বলা হয়। বিষয়কে অস্বীকার করিলে বিষয়ীকেও অস্বীকার করিতে হয়। কারণ বিষয়ের সহিত বিষয়ীর নিত্য সম্বন্ধ। বিষয়ী বিষয়

ভিন্ন, গুণী গুণ ভিন্ন এবং সত্তা প্রকাশ ভিন্ন থাকিতে পারে না। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে ইহার প্রকাশকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। বিষয় বিচিত্র বলিয়া মানবের জ্ঞানও বিচিত্র।

এক্ষণে বুঝা গেল বিশ্ব ব্রহ্ম-সাপেক্ষ হইলেও ইহার পৃথক্ সত্তা রহিয়াছে। ইহা ব্রহ্মমাত্র নহে। সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মার প্রকাশ হইলেও তুটিকে এক করিয়া ফেলা যুক্তি সঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে জীবাত্মা মিথ্যা কল্পনাও নহে। জীবাত্মার আদি কারণ ব্রহ্মপ্রকৃতি। ব্রহ্মই মায়া বলে জীবাত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মায়া তাঁহারই লীলা।

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্যমহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ।

'জীবাত্মা ও পরমাত্মা যেন এক বৃক্ষে আসীন তুটি পক্ষী। তাদের একটি সুস্বাতু ফল ভক্ষণ করিতেছে, অন্যটি শুধু দর্শন করিতেছে। জীবাত্মারূপ পক্ষীটি আশ্রয় বৃক্ষে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে। আবার শক্তি-হীন বলিয়া এই আসক্তির জন্য শোক করিতেছে। আবার যখন অনাসক্ত পরমাত্মরূপী পক্ষীটির দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে তখনই শোক সম্বরণ করিতেছে।'

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের তুই অবস্থা স্বীকার করেন। প্রলয়ে যখন

সমগ্র জগৎ সূক্ষ্মদশা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসত্তায় প্রবিষ্ট হয় তখন তাহার নাম-রূপের ভেদ থাকে না। তখন ব্রহ্মের কারণাবস্থা। তিনি পুনরায় সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; তখন তাঁহার কার্য্যাবস্থা। তখন জড় ও চিন্ময় জগৎ স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জগৎ কখনও আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ব্রহ্ম-সত্তায় একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে না। প্রলয় কালে ইহা স্থূলাবস্থা পরিহার করতঃ সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইবে এই মাত্র।

জড় ও জীবকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমাদের শরীরের মধ্যদিয়া যেরূপ আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তি বহির্জ্জগতে প্রকাশ পায় সেরূপ জড় ও চেতনার মধ্যদিয়া ব্রহ্মশক্তির অভিব্যক্তি ঘটে। জগৎ যে নিত্য পরিণামী এই ভাবটী ব্যক্ত করিবার জন্য ইহাকে শাস্ত্রে অসৎ বলা হইয়াছে। জগৎ মায়িক অবস্তু এরূপ ভাব প্রকাশ করা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। প্রতি মুহূর্ত্তেই যাহার এত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহাকে কিছুতেই ব্রহ্মবস্তুর সহিত সমান আসন দেওয়া যায় না। ইহা ব্রহ্মের তুল্য সৎ নহে। জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নহে। জীব নানা দুঃখ যন্ত্রণার অধীন। ব্রহ্ম সর্ব্বদুঃখাতীত। শাস্ত্রে অনেক স্থলে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ জীব ব্রহ্মের দেহস্বরূপ। দেহের সহিত দেহীর যে সম্বন্ধ জীবের সহিত ব্রহ্মের সেরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জীবা-আর মূল উপাদান ব্রহ্ম। জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইলেও ইহা তাঁহারই লীলাবিলাস। জীবাত্মা ও বিশ্ব উভয়ই সত্যবস্তু। পরমাত্মাকে লাভ করাই জীবাত্মার পরম পুরুষার্থ। ইহাই জীবাত্মার চরম লক্ষ্য।

কি উপায়ে মানুষ আপনার সকল ক্ষুদ্রতা হইতে দিন দিন উদ্ধার লাভ করতঃ পরম পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে, রামানুজ সে সম্বন্ধে বলিতেছেন,—'যিনি সর্ব্বদা সদ্‌গুরুর উপদেশে শাস্ত্র সমূহ

অধ্যয়ন করতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করেন, এই জ্ঞানের অনুবলে যিনি শম, দম, তপঃ, শৌচ, অভয়, বিবেক, দয়া, অহিংসা ইত্যাদি গুণাবলী সঞ্চয় করিতেছেন, যিনি নিত্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিহার করতঃ সদাচার অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া স্তব, বন্দনা, কীর্ত্তন, ধ্যান, অর্চ্চনা ও প্রণামাদি দ্বারা পরম কারুণিক পরব্রহ্মের প্রসাদ লাভের অধিকারী হইতেছেন এইরূপ সাধকই ব্রহ্মপদলাভের উপযুক্ত। যিনি মুক্তিপ্রয়াসী হইয়া বেদান্তসিদ্ধ জ্ঞানানুযায়ী ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করতঃ তদ্দ্বারা নির্ম্মলা প্রীতি লাভ করেন তিনিই সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

রামানুজাচার্য্য এদেশে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী রূপে পরিচিত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার দ্বৈতবাদ কিন্তু পৌরাণিক দ্বৈতবাদের ন্যায় স্থূল নহে। তাঁহার মতে বিশ্ব ও জীবের ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র সত্তা রহিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্যের সীমা কোথায় তিনি স্পষ্টরূপে তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি দার্শনিক হইলেও ভক্তিমার্গাবলম্বী ছিলেন। তজ্জন্য বিশ্ব ও জীবের স্বতন্ত্র সত্তা সপ্রমাণ করিতে গিয়া একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীভাষ্যের বহুস্থলে তাঁহাকে উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন নাই। অবশ্য ইহা তিনি বহুস্থলে স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রহ্মই এই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, কিন্তু তিনি জড় জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিরূপে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছারূপী ব্রহ্ম হইতে জড় পদার্থের উৎপত্তি হইল, কিরূপেই বা এই জড়জগৎ প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার সত্তায় অবস্থান করিতেছে তিনি এ সকল জটিল সমস্যার সমাধান করেন নাই। আবার জীবের উৎপত্তি

ব্রহ্ম হইতে, জীবের স্থিতিও ব্রহ্মসত্তায়; অথচ জীবের স্বাধীনতা রহিয়াছে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতেও তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। স্কটিশ দার্শনিকদিগের ন্যায় (Scottish School of Commonsense), তিনি এস্থলে সাধারণ বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের ন্যায় এ বিষয়ে তিনিও দ্বৈতবাদী।

পাশ্চাত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে অনেকে বিজ্ঞানবাদ নামে অভিহিত করেন। ভারতীয় বিজ্ঞানবাদের সহিত ইহার বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুটী সর্ব্বাংশে এক নহে। যাহা হউক এদেশের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সঙ্গেও ইহার যে সর্ব্বাংশে ঐক্য নাই ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। তবে বিরোধও যে বেশী আছে তাহা নহে। আমরা পাশ্চাত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা বিজ্ঞানবাদের (Idealism) আলোচনা এস্থলে অতি সংক্ষেপে উপস্থিত করিব। বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করিতে গেলে ভারতীয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আলোচনাস্থলে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহার অনাবশ্যক পুনরুক্তি হইবে মাত্র।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদিগণের (Idealists) মতে এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টিমূলে এক মহাশক্তি বিরাজ করিতেছে। এই মহাশক্তি হইতেই অসংখ্য জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টির যাবদীয় বস্তু এই শক্তিকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু জড়বাদি-গণের ন্যায় ইঁহারা এই শক্তিকে অন্ধ জড়শক্তি বলেন না। তাঁহাদের মতে এই শক্তি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন। এই শক্তি এক ও অদ্বিতীয়। ইহাতে একাধারে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার সম্মিলন রহিয়াছে। জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির সমন্বয়ে ইঁহার প্রকৃতি গঠিত বলিয়া এই মূলাধার পরম

বস্তুকে পরমপুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব নহে। তিনি পূর্ণ জ্ঞানরূপে সমগ্র বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং জড় পদার্থ বলিয়া তাঁহার সত্তার বাহিরে কোন বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করাও অসম্ভব। কেননা তাহা হইলে তাঁহার সত্তা সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবে। আমরা আত্মজ্ঞান হইতে যে ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হই সে ব্রহ্ম পূর্ণ জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছারূপী। তাঁহাকে কিছুতেই অপূর্ণ বলা যায় না। বিশ্বের যাবদীয় পদার্থ এই মহাজ্ঞানে অবস্থান করতঃ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। শুধু যে বিশ্বের মূল উপাদান (matter) তাঁহার প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত তাহা নহে। যে দেশ কালের মধ্য দিয়া এই বিশ্ব প্রকটিত হইয়াছে তাহাও তাঁহার প্রকৃতি-নিহিত। অর্থাৎ দেশ (space) এবং কাল (time) নামে যে দুটী ধারণা আমাদের বাহ্য জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে তাহা তাঁহার জ্ঞানে বাহ্য বস্তুর আধার রূপে বিরাজ করিতেছে। বিশ্বের ঘটনাবলী সময়ের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়; অর্থাৎ সকল ঘটনার একটা পূর্ব্বাপর ক্রম রহিয়াছে। একটী ঘটনা অপর একটী ঘটনার পূর্ব্বে ঘটিবে। মনে করুন বৃক্ষের একটী পত্র নড়িতেছে। ইহার পূর্ব্বে বায়ুসঞ্চালন নামে একটা ক্রিয়া চলিয়াছে। পাতাটী নড়াতে বায়ুর মধ্যে যে একটা মৃদু তরঙ্গের উৎপত্তি হইল ইহা তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা। এই যে পূর্ব্ব পশ্চাৎ সম্বন্ধের ধারণা ইহা আমার জ্ঞানে। এরূপে শুধু পাতা নড়া ব্যাপারটী যে আমার জ্ঞানে সংঘটিত হইল তাহা নহে। দুটী ঘটনার মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল তাহাও আমার জ্ঞানে। সুতরাং এস্থলে আমিই এই সম্বন্ধ স্থাপনের মূলে। অর্থাৎ এস্থলে আমি সময়েরও স্রষ্টা। এরূপে বিশ্লেষণ

করিলে দেখা যায় যে স্থানের (space) ধারণাও জ্ঞানসাপেক্ষ। বৃক্ষের পত্রটী যে একটী স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ইহাও আমিই বুঝিতেছি। শুধু তাহা নহে, আমার সকল অভিজ্ঞতাই দেশ কালের জ্ঞানসাপেক্ষ। স্বীয় ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা দ্বারা যেমন বুঝিতে পারিলাম যে একটী ঘটনা বা বস্তু উপলব্ধি করিবার জন্য আমার দেশ ও কাল নামে দুটী ভাবের (idea) প্রয়োগ করিতে হয় সেরূপ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ স্বীয়জ্ঞানে ধারণ করিবার জন্য সেই পূর্ণজ্ঞান পূর্ণ পুরুষ দেশ ও কাল নামে দুটী ভাবের (idea) সৃষ্টি করেন। শুধু জ্ঞানই যে তাঁহার প্রকৃতি তাহা নহে; শুধু যে দেশ ও কাল নামে দুটী ভাবের সাহায্যে সমগ্র বিশ্বকে আপনার সত্তার মধ্যে ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার অফুরন্ত প্রেমধারাও এই বিশ্বকে নিয়ত অভিষিক্ত করিতেছে। এই প্রেম তাঁহার প্রকৃতি-নিহিত। এই প্রেম হইতেই বিশ্ব ও জীবের উৎপত্তি। এই প্রেমই বিশ্ব ও জীবের জীবিকা। অনাদি কাল হইতে লীলাময় পূর্ণ পুরুষ এই বিশ্ব রঙ্গালয়ে প্রেমের লীলা করিতেছেন। তাই তাঁহার সৃষ্টি এত সুন্দর, এত শান্তিদায়ক। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানবজীবনের মহত্ত্বের মধ্যে তিনিই প্রেমরূপে বিরাজমান। এই প্রেম হইতেই কর্ম্মশক্তি সমুদ্ভূত। বিশ্বকে, জীব জগৎকে এত ভাল বাসেন বলিয়াই ত তিনি নিয়ত সৃষ্টিকার্য্যে লিপ্ত। এই নিত্য ক্রিয়াশীলতা তাঁহার প্রেমলীলা। কিন্তু ইহা বুঝিতে হইবে না যে জ্ঞান হইতে প্রেম এবং প্রেম হইতে শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাই তাঁহার প্রকৃতি। তিনি ত্রিশক্তি-রূপী। তিনটী এক সূত্রে গ্রথিত থাকিয়া তাঁহার সত্তা বা প্রকৃতি গঠন করিয়াছে। এই তিনটী তাঁহার অখণ্ড সত্তার তিনটী দিক্। তিনি

জ্ঞান ও প্রেম ছাড়া যেমন থাকিতে পারেন না, ক্রিয়াবিহীন হইয়াও থাকিতে পারেন না। সুতরাং কোন এক নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে ইহা বলা কিছুতেই সমীচীন নহে। এই সৃষ্টির প্রারম্ভ ও ধ্বংস নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে ইহার উৎপত্তি যেমন কল্পনা করা যায় না, অকস্মাৎ ইহার বিলোপও কল্পনা করা যায় না। সৃষ্টির আদি নাই,অন্ত নাই। ইহা আদিপুরুষের সনাতনী মায়া। এই সৃষ্টি তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র।

এই ইচ্ছা তাঁহার প্রকৃতির অন্যতম দিক্। কোন চিত্রকর যদি একটী চিত্র অঙ্কন করেন, সে চিত্রটী যেমন তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির একটা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র সৃষ্টিনৈপুণ্যের মধ্যে যেমন তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির প্রকাশ পাইতেছে, ঠিক্ সেরূপ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের জ্ঞান ও ইচ্ছাকে একটা আকার প্রদান করিতেছে। জ্ঞান হইতে যাহার উৎপত্তি জ্ঞানেই তাহার স্থিতি সম্ভব। জ্ঞানের বাহিরে জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অতএব এই বিশ্ব ও তাহার আধার স্বরূপ দেশ ও কাল তাঁহার জ্ঞানেই অবস্থিত। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার জ্ঞানেই ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে। তিনি একদিকে যেমন বিশ্বের আদি কারণ অন্যদিকে আবার ইহার চির আশ্রয়। এই বিশ্ব আবার দিন দিন তাঁহার পূর্ণ প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার পূর্ণ স্বরূপই ইহার একমাত্র পরিণতি। মানবপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার মধ্যে জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছার এক অপূর্ব্ব সমন্বয় রহিয়াছে। এই জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাই মানবের প্রকৃতি। মানুষ অসংখ্য কার্য্যের মধ্য দিয়া আপনার এই ত্রিশক্তিমূলক নিত্য-প্রকৃতিকেই ব্যক্ত করিতেছে। মানুষের আর ইহার বাহিরে পা বাড়াইবার যো নাই। সুতরাং মানব-প্রকৃতি ব্রহ্ম-প্রকৃতির আদর্শেই গঠিত। কিন্তু মানুষের জ্ঞান, প্রেম ও

ইচ্ছা চিরদিন অপূর্ণ। মানুষের ইচ্ছা ও জ্ঞান সৃষ্টির অতিক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ। মানবের প্রেমও কয়েকটী মাত্র বস্তু ও জীবকে অবলম্বন করিয়াই তৃপ্ত রহিয়াছে। ইচ্ছাশক্তিও প্রতিনিয়ত প্রতিহত হইতেছে; ইহা কয়েকটী মাত্র বস্তু বা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। বিশ্বের যতটুকু অংশ আমার জ্ঞানে রহিয়াছে ততটুকুই আমার; পক্ষান্তরে পূর্ণ পুরুষের পূর্ণ জ্ঞান অসীম বিশ্বকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। অনন্ত পৃথিবী, অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র, অনন্ত সৌর জগৎ তাঁহার জ্ঞানে অন্তর্নিবিষ্ট। সে জ্ঞানের কূল কিনারা নাই। তাহা সর্ব্বগ্রাসি, সর্ব্বময়। তাঁহার প্রেমেরও কূল কিনারা নাই। এই অসীম প্রেম-পারাবারে নিখিল বিশ্ব নিমগ্ন। আবার এই বিশাল অখণ্ড বিশ্ব তাঁহার পূর্ণ শক্তির এক-কণাও ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা তাঁহার সত্তার বিশাল পারাবারে এক একটী ক্ষুদ্র নগণ্য জলবিম্বমাত্র। তিনি আমাদের সারা জীবনের সম্বল। তিনিই আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতির মূলে। তিনি যে শুধু জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতেই আমাদের আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছেন তাহা নহে। তিনি পুণ্য ও পবিত্রতার পরিপূর্ণ আদর্শ। যুগ যুগান্তর ধরিয়া আমরা তাঁহার পরিপূর্ণ পুণ্যালোকে বিচরণ করিব। অনন্ত জীবন ধরিয়া আমরা সেই অসীম পুণ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁহার দিকে ছুটিতে থাকিব। তিনি যে শুধু 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' তাহা নহে, তিনি 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধং'। পুণ্য বা পবিত্রতাই তাঁহার প্রকৃতি। তিনি চিরশুভ্র ও চিরনিষ্কলঙ্ক। তিনি পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শরূপে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের প্রাণের অন্তঃস্থলে পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতেছেন। চিরদিন আমা-দিগকে এই চিরশুভ্র, চিরপবিত্র মূর্ত্তি দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতেছেন। তাই পাপে আমাদের তৃপ্তি নাই, আনন্দ নাই; অপবিত্রতা লইয়া আমাদের শান্তি নাই।

একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। যদি বিশ্বের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতেই বলা যায়, তাহা হইলে কি ব্রহ্মের প্রকৃতিকে অপূর্ণ বলা হয় না? তাঁহার প্রকৃতির কতকটা অংশ ত বিকৃত হইয়া গেল। তিনি ত অংশতঃ বিশ্বাকারে পরিণত হইলেন। তখন কি করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ ও নির্ব্বিকার বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর অদ্বৈতবাদের সমালোচনা কালে দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহার জ্ঞানে ভাবসমষ্টিরূপেই (an aggregate of ideas) এই বিশ্ব অবস্থান করিতেছে। তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব থাকিয়াও আপনার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাকে জড়বস্তু এবং সজীব পদার্থরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ। মনে করুন আমার সম্মুখে একটী কমলালেবু রহিয়াছে। আমি এই ফলটীকে যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে ইহার বর্ণ, গন্ধ, কোমলতা, সরসতা, কমনীয়তা প্রভৃতি সংহত গুণাবলীর প্রত্যেকটী আমার মনের এক একটী ভাব ব্যক্ত করিতেছে মাত্র। ইহার প্রত্যেক গুণটী আমার জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু তাই বলিয়া আমি নিজেই কমলালেবু রূপে পরিণত হইয়া গেলাম না। আমার জ্ঞান ক্রিয়াটা সাময়িক ভাবে কমলালেবু রূপে একটা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল বটে, কিন্তু জ্ঞাতারূপে আমি ইহা হইতে স্বতন্ত্র রহিয়া গেলাম। ঠিক্ সেরূপ ব্রহ্মও আপনার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাকে বিশ্বরূপে একটা সাময়িক আকার প্রদান করিলেও তিনি আপন সত্তায় পূর্ণ, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব থাকিতে সক্ষম। আমার জ্ঞানের বস্তু যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন আকার ধারণ করিতেছে, অর্থাৎ হয়ত এখন একটী ফল দেখিতেছি, পরক্ষণে হয়ত একটী ফুল দেখিব, তারপর হয়ত একটী পত্র দেখিব, ঠিক্ সেরূপ সেই পূর্ণজ্ঞানে সমগ্র বিশ্ব নিত্য নূতন ভাবে দেখা দিতেছে। তিনি

এই বিশ্বকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি, খণ্ড ও অখণ্ডরূপে চিরদিন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বিশ্বের অগণিত বস্তু ও ঘটনা এই মহাজ্ঞানের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। এই মহাজ্ঞান দেশকালের অধীন নহে, অথচ দেশকালে নিবদ্ধ পদার্থসমূহ ইহার সাহায্যে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করিতেছে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত দার্শনিক প্রফেসার Green বলিতেছেন,—

"If by nature we mean the object of possible experience, the connected order of knowable facts or phenomena—and this is what our men of science mean by it when they trace the natural genesis of human character—then nature implies something other than itself, as the condition of its being what it is. Of that something else we are entitled to say, positively, that it is a self-distinguishing consciousness ; because the function which it must fulfil in order to render the relations of phenomena, and with them nature, possible, is one which, on however limited scale, we ourselves exercise in the acquisition of experience, and exercise only by means of such a consciousness. There could be no such thing as time if there were not a self-consciousness which is not in time. As little there could be a relation of objects as outside each other, or in space, if they were not equally related to a subject which they are not outside."

স্বনামখ্যাত দার্শনিক ইমেনুয়েল ক্যাণ্টই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠাতা। লক্ ও হিউমের মধ্যেও ইহার আভাস পাওয়া যায় বটে; কিন্তু ক্যাণ্টই পরিস্ফুট আকারে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বহির্জ্জগৎ একটা বিজ্ঞানসমষ্টি মাত্র। কিন্তু এই বিজ্ঞানসমষ্টির ব্যতিরিক্ত বস্তুর প্রকৃত সত্তা যে কি তাঁহার মতে তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিজ্ঞানের বাহিরে যাওয়ার আমাদের কোন অধিকার নাই। মানবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ক্যাণ্ট অজ্ঞেয়বাদী। তাঁহার মতে মানবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানি তাহা শুধু একটা ভাবসমষ্টি মাত্র। হিগেল, ফিক্‌টে প্রভৃতি তাঁহার পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই এই সংশয়বাদের পরপারে গিয়াছেন। তাঁহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ইংরেজ দার্শনিক কেয়ার্ড ও গ্রীণ এই বিজ্ঞানবাদকে আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সমূহ অবলম্বন করিয়াই আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদ বিবৃত করিলাম।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদ সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহার মূল আত্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী আত্মবিশ্লেষণ করতঃ তাহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদিগণ বিশ্বতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সেশ্বরবাদের প্রারম্ভেই তাহা বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। তবে তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি ভারতীয় ব্রহ্মবাদের ন্যায় এতটা গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয় না। বাদরায়ণ, শঙ্করাচার্য্য, নিম্বাদিত্য প্রভৃতি ভারতীয় দার্শনিক ঋষিগণ আরও অধিকতর অগ্রসর ছিলেন। তাঁহাদিগের দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধন-বৈরাগ্যের যে আভাস পাওয়া যায় তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদে পাওয়া

যায় না। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তে কতকগুলি অসঙ্গতিও রহিয়াছে। শঙ্কর দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ইংরেজ দার্শনিক ডাক্তার মার্টিনোর নাম এদেশের শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। অনেকের নিকট তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলিয়া পরিচিত। স্থূল দ্বৈতবাদের প্রতিবাদ করিয়া তিনি যে ব্রহ্মবাদকে অধিকতর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তের মধ্যে কতকগুলি অসঙ্গতি রহিয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহার মতে দেশকালের একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা রহিয়াছে। বিশ্বস্রষ্টা এই দেশকালের সাহায্যে আপন ইচ্ছাশক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশ ও কালের স্বাধীন সত্তা ভিন্ন বিশ্বসৃষ্টি অসম্ভব হইত। কিন্তু আমরা তাঁহার এই মত গ্রহণ করিতে পারি না। যে অর্থে দেশকালের অন্তর্গত বস্তু সমূহের অস্তিত্ব রহিয়াছে ঠিক্ সেই অর্থে দেশকালের অস্তিত্ব নাই। দেশ ও কাল ঘটনার আধার মাত্র। ইংরেজী ভাষায় ইহাদিগকে forms of thought বলা হয়। দেশ বলিলে আমরা বিস্তৃতি (extension) ও স্বাতন্ত্র্য (exclusion) মাত্র বুঝি। একটী বস্তু স্থানে রহিয়াছে বলিলে ইহা বুঝায় যে তাহার একটা বিস্তৃতি অর্থাৎ পরিসর আছে এবং অন্যান্য বস্তু হইতে ইহা পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে extension অর্থাৎ বিস্তৃতি এবং exclusion অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যকে আমরা দেশ বা স্থান (space) আখ্যা প্রদান করিয়াছি। এই দুইটী আমাদের মনের ভাবের নাম মাত্র। সুতরাং মনোরূপী শক্তি হইতে ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অতএব স্থান বা দেশ মন হইতে স্বতন্ত্র নহে। কাল বলিলে আমরা ঘটনার একটা পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলা বুঝি। এই ক্রমের

(succession) যে ভাব তাহাও মনঃসম্ভূত। সুতরাং কালেরও একটা স্বাধীন সত্তা নাই।

ডাক্তার মার্টিনোর আর একটী মত বিশেষ আপত্তিজনক। তিনি মানবাত্মাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিতে চাহেন। তাঁহার এই মানবাত্মার স্বাধীনতার মত অত্যুক্তি-দোষ-দুষ্ট। তাঁহার মতে মানুষ ভবিষ্যতে যাহা করিবে তাহা ভগবানের অজ্ঞাত। কারণ তাঁহার জ্ঞানে থাকিলে সে সম্বন্ধে মানুষের আর স্বাধীনতা রহিল না। তাঁহার জ্ঞান ও বিধান একই জিনিস। ইহাতে মোটামোটি এই বুঝায় যে ঈশ্বরের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। আমরা এরূপ ভ্রান্ত মতের পক্ষপাতী হইতে পারি না। তবে মানবাত্মার স্বাধীনতাও অভ্রান্ত সত্য। এই স্বাধীনতা ও ঈশ্বরপরতার বিষয় মীমাংসা করিতে হইলে সুদীর্ঘ প্রবন্ধের প্রয়োজন। আমরা 'মানবাত্মার স্বাধীনতা' নামক প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচনা করিব। ফলতঃ ডাক্তার মার্টিনোকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী না বলিয়া বিশিষ্টদ্বৈতবাদী বলিলেই ঠিক্ হয়। কারণ তিনি অনেকটা দ্বৈতবাদের দিকেই অগ্রসর। তবে তাঁহার দ্বৈতবাদ স্থূল দ্বৈতবাদ হইতে বহু পরিমাণে উন্নত। আত্মবিজ্ঞান ও বিশ্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে যুক্তি পরম্পরার অবতারণা করিয়া তিনি যে ভাবে জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদ দূরীকৃত করিয়া দিয়াছেন তাহা সেশ্বরবাদী মাত্রই গ্রহণ করিবেন। আমরা জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের সমালোচনা কালে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি; এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সে সকল সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে সে সকল বিষয়ের অবতারণা করার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব এখানেই আমরা পাশ্চাত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদের আলোচনা শেষ করিলাম।

উপসংহার।

আমরা এতক্ষণ ধরিয়া ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করিলাম। এই বিস্তৃত সমালোচনার ফলে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম ; সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করতঃ, আমরা এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিব।

সর্ব্বপ্রথমে আমরা জড়বাদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। জড়বাদিগণের মতে বিশ্বের যাবদীয় পদার্থ মৌলিক জড়-পরমাণু সমূহের সংযোগে সমুদ্ভূত। এই পরমাণু সকল নিখিল জগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কিরূপে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জড়-পরমাণুগুলি পরস্পর সম্মিলিত হইয়া প্রস্তর মৃত্তিকা প্রভৃতির সৃষ্টি করিল, জড়বাদিগণ তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের উদ্ভাবিত অন্ধ জড়-শক্তির অস্তিত্বই আমাদের অভিজ্ঞতা-বিরুদ্ধ। আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যসমূহ এক জ্ঞানময়ী ইচ্ছাশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই বিশ্ব ইহার অনুরূপ এক কৌশলময়ী শক্তি হইতে সমুদ্ভূত। জড়-শক্তি হইতে মানুষের জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না। মানুষের আত্মজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান, প্রেম পবিত্রতা প্রভৃতি এক জ্ঞান প্রেম ও পুণ্য সমন্বিত মহাশক্তির পরিচয় দিতেছে। কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা থাকিতে পারে না। যে শক্তি বিশ্ব ও মানবজীবনের সৃষ্টি মূলে অবস্থিত, তাহাতে যদি জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা না থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বে ও মানবজীবনে এত জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার প্রকাশ থাকিত না।

অজ্ঞেয়বাদিগণের মতে বিশ্বের যাবদীয় ঘটনাবলী এক নিত্য বস্তুর আভাস প্রদান করে। কিন্তু এই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। আমাদের নিকট এই বিশ্ব এক ঘটনা-সমষ্টি মাত্র। মানব জীবনও শুধু একটা পরিবর্ত্তনশীল ভাবসমষ্টি মাত্র। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই আমরা জানিতে পারি না। কারণ আমাদের মনোবৃত্তি ঘটনাবলীর সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। তবে এক নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব বলিয়াই মনে হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়-গণই সমগ্র জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণই যখন এই নিত্যবস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই প্রদান করে না, তখন সে সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ না করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আময়া দেখিয়াছি যে এই অজ্ঞেয়বাদ যুক্তি বিরুদ্ধ, বিচার বিরুদ্ধ এবং মানবজাতির বিশ্বাস বিরুদ্ধ। একজন দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা ভিন্ন ঘটনাবলীর অস্তিত্বই অসম্ভব। ঘটনা নিজে জ্ঞানবিশিষ্ট হইতেই পারে না। ঘটনাবাদিগণ ঘটনা সমষ্টিকেই জ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু একটা ঘটনাসমষ্টি জ্ঞানবিশিষ্ট হইতে পারে না। যে জ্ঞান ব্যষ্টিতে নাই, তাহা সমষ্টিতে থাকিতে পারে না। মানবাত্মা যদি শুধু একটা ভাবসমষ্টিই হইবে, তাহা হইলে পরিবর্ত্তনশীল বস্তু সমূহকে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ইহার পক্ষে সম্ভব হইত না। অতীত ঘটনার স্মৃতিও সম্ভবপর হইত না। আমি যে চির পুরাতন আমি, এ ধারণাও সম্ভব হইত না। এমন কি পূর্ণ ও নিত্য বলিয়া দুটি শব্দই থাকিত না। নিত্য ও অনিত্য পরস্পর তুলনা-সাপেক্ষ,, পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিতে পারি যে আমাদের ইচ্ছাশক্তিই আমাদের সকল কার্য্যের মূল। এই অনন্ত বিশ্ব পূর্ণ

করিয়া যে এক অফুরন্ত ক্রিয়া চলিতেছে, তাহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই এক অফুরন্ত ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে।

জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের সমালোচনা শেষ করিয়া আমরা সেশ্বরবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেশ্বরবাদিগণ মোটামোটি তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রথম সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, দ্বিতীয় অদ্বৈতবাদী এবং তৃতীয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। ব্রহ্মের সহিত বিশ্ব ও মানবজীবনের সম্বন্ধ লইয়া এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎকট মতভেদ রহিয়াছে।

দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ বলেন, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ স্রষ্টা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি কতগুলি চিরন্তন নিয়মের অনুবলে এই জগৎ শাসন করিতেছেন। ইহাতে ব্রহ্মসত্তাসংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আত্মতত্ত্ব হইতে আমরা যে পূর্ণব্রহ্মের পরিচয় পাই, তাঁহাকে এরূপভাবে সসীম করিয়া দেওয়া অসঙ্গত। পূর্ণসত্তার বাহিরে আবার এমন কোন শক্তিই থাকিতে পারে না, যাহাদ্বারা স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। আবার ভগবৎ-প্রকৃতি জড়-জগতে ও জীবজগতে অভিব্যক্ত বলিয়াই আমাদের পক্ষে ভগবৎ-প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভবপর হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদের বিপরীত। অদ্বৈতবাদিগণ বিশ্ব ও স্রষ্টার মধ্যে কোন পার্থক্যই স্বীকার করেন না। দ্বৈতবাদের অসঙ্গতি দূর করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদিগণ অন্ধভাবে ঠিক্ ইহার বিপরীত দিকে ছুটিয়াছেন। ভারতীয় অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পরব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু। বিশ্ব ও জীবের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আমরা যে বিশ্ব ও জীবের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করি, তাহা আমাদের অজ্ঞানতার পরিচায়ক। মায়া বা অজ্ঞানতার হস্ত

হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলে একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন যে আর কিছুই নাই, তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইবে। ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে শুধু নামের প্রভেদ। এই নামভেদও আবার নিরুপাধি নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে দেহাদিধর্ম্মের আরোপেই সংঘটিত। বস্তুতঃ জীবাত্মাও শুদ্ধ বুদ্ধ ও নির্ব্বিকার।

অদ্বৈতবাদিগণের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, তাঁহারা ভগবৎ-সত্তায় উপনীত হওয়ার দুটী রাস্তাই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মসত্তায় পঁহুছিতে হইলে আমাদের দুটী ভিন্ন রাস্তা নাই। এক আত্মতত্ত্ব আর এক বিশ্বতত্ত্ব। বিশ্ব ও জীবাত্মাকে ভ্রান্তি-সম্ভূত বলিলে পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। বস্তুতঃ, পূর্ণব্রহ্ম আপনাকে অপূর্ণ বিশ্ব ও মানবাত্মারূপে ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাত্মা ও মানবাত্মার আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মসত্তায় উপনীত হইতে পারি। আবার অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়া থাকেন। তাঁহাতে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার আরোপ করিতে চাহেন না। বাস্তবিক, জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা বিবর্জ্জিত নির্গুণ ব্রহ্মটী যে কি জিনিস আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ একটী সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়াই ঘোর মায়াবাদে উপনীত হইয়াছেন। এই সমস্যা ব্রহ্মের পূর্ণত্ব ও বিশ্বের অস্তিত্বের সামঞ্জস্য লইয়া। বিশ্বকে যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে আর পূর্ণ বলা যায় না। কারণ পূর্ণত্ব সর্ব্বগ্রাসি। আবার অন্যদিকেও আর এক বিপদ্। জগৎকে যদি ব্রহ্মসত্তার অন্তর্ভুক্ত বলা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মসত্তা অংশতঃ পরিবর্ত্তনশীল হইয়া দাঁড়ায়। কারণ জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং ব্রহ্মকে আর নির্ব্বিকার ও অপরিবর্ত্তনীয় বলা যায় না।

এই জটিল সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের মতে এই বিশ্ব একটা বিজ্ঞানসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক পূর্ণ জ্ঞানময় সত্তায় ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। বিশ্বের যে অংশ আমাদের জ্ঞানগোচর তাহা যে 'ন আমাদের বিজ্ঞানসমষ্টি মাত্র, সমগ্র বিশ্বও তেমনই সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানময় সত্তায় অখণ্ড বিজ্ঞানসমষ্টিরূপে অবস্থান করিতেছে। আপন সত্তায় পরিপূর্ণ থাকিয়াও পরব্রহ্ম বিশ্বের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া আপনাকে সসীম আকারে ব্যক্ত করিতে সমর্থ। তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার থাকিয়াও সবিকার বিশ্বরূপে প্রকটিত। আপন জ্ঞানময়ী সত্তার বিজ্ঞান সমষ্টিকে তিনি দেশকালনিবদ্ধ বস্তুরূপে আমাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহার মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার পূর্ণতা রহিয়াছে। সুতরাং তিনি সগুণ। এই সগুণ ব্রহ্ম আপনার গুণাবলীর বিকারভূত বিশ্ব প্রপঞ্চকে জ্ঞানের বিষয়রূপে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আবার সগুণ হইয়াও তিনি নির্গুণ। কারণ গুণী গুণ হইতে স্বতন্ত্র। গুণী গুণ-মাত্র নহে। গুণী আধার, গুণ আধেয়। তাই বলিয়া গুণকে গুণী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কারণ গুণ প্রতিনিয়ত গুণীকে আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে। ব্রহ্ম ও বিশ্ব উভয়ই সত্য। ব্রহ্ম পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, ও পূর্ণ ইচ্ছারূপে সত্যবস্তু। বিশ্ব পূর্ণ পুরুষের অপূর্ণ প্রকাশ-রূপে সত্য। জীবাত্মাও পরমাত্মার আংশিক প্রকাশ রূপেই সত্য। ইহাই ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈত মীমাংসা।